তাজিক লোককাহিনী

তাজিক লোককাহিনী

'রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

অনুবাদ: পূর্ণিমা মিত্র

অঙ্গসজ্জা: ইলিয়াস মুর্সালিমভ

ТАДЖИКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали.

TAJIK FOLK TALES

in Bengali

© বাংলা অনুবাদ · অঙ্গসজ্জা · 'রাদুগা' প্রকাশন · তাশখন্দ · ১৯৯০ সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$T\ \frac{4803540104-468}{031(01)-90}\ 106-90$

ISBN 5-05-002903-1

সূচী

মজাফফর ও তার ঘোড়া ৫
কিমিওগার ১৬
নিষ্ঠুর বাই ও বুদ্ধিমান নেড়ামুণ্ডু ৩০
এক চালাক মেয়েমানুষের কীর্তিকলাপ ৩৫
খাটিয়ে চাষী ৪০
দুই কিপটের গল্প ৪৫
ধূর্ত কবি ৪৭
হাসান ও নেকড়ে ৪৯
জেলের ছেলে ও গুলদোর মাছ ৫৫
জাদুকরের দান ৬৩
সোনার পাখী তিলোগিন ৬৮
পালোয়ান আর সিমুর্গ পাখী ৭৪
তাঁতী — পালোয়ান ৮০
পিতৃ উপদেশ ৮৩
গাঁজাখুরী গল্পের লড়াই ৮৮
পৃথিবী বিজেতা-গাধা ৯১
কথাবলা মোহর ৯৪
সোনার চাব ৯৯
নতুন শহর নাভোবদ ১০১
তীরন্দাজ আর তার বন্ধুরা ১০৭

মুজাফ্‌ফর ও তার ঘোড়া

বহুদিন আগে এক বাদশাহ ছিলেন, দীর্ঘদিন তাঁর কোন সন্তান হয় না। শেষে তাঁর স্ত্রী এক ছেলের জন্ম দিয়ে মারা যান সঙ্গে সঙ্গেই। স্ত্রীর শোকে এমন ভেঙে পড়লেন তিনি যে ছেলের মুখও দেখতে চাইলেন না সেই তার মায়ের মৃত্যুর কারণ বলে: ধাইয়ের ওপর তাকে বড় করে তোলার ভার দিয়ে কড়া আদেশ দিলেন তাকে যেন লুকিয়ে রাখা হয় লোকচক্ষুর আড়ালে, এমন কি দিনের আলোয় যেন তাকে কখনও বাইরে আনা না হয়।

ছেলেটির নাম দেওয়া হল মুজাফ্‌ফর। রাখা হল তাকে মাটির নীচে তৈরী এক বাড়ীতে, যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ নিষেধ — কেবল বাড়ীর ছাদের গম্বুজটা উঠে আছে মাটির উপরে। বাড়ীর বাইরে কখনও যেতে দেওয়া হয় না তাকে, কখনও সূর্য দেখে নি সে।

পাঁচবছর বয়স থেকে তাকে লেখাপড়া শেখান আরম্ভ হল। এমন বুদ্ধিমান সে যে পনরবছর বয়সেই যে যে বিষয়ে তাকে পড়ান হত তাতে পণ্ডিত হয়ে উঠল।

শিক্ষক সবসময়েই বাদশাহকে জানাতেন ছেলেটির অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার কথা। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই দেখতে চান না ছেলেকে, কেবলই বলেন তাকে আরও বিদ্বান করে তুলতে।

একদিন শিক্ষক বুঝলেন যে মুজাফ্‌ফরকে আর কিছু শেখাবার নেই তাঁর, তাই নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য তিনি এই কঠিন দায়িত্বের থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।

গ্রীষ্মকালের একদিনে তিনি মুজাফ্‌ফরের বাড়ীর ছাদের গম্বুজ থেকে একটা ইঁট বার করে নিলেন। আধাঅন্ধকার ঘরে এসে ঢুকল সূর্যের আলো। উজ্জ্বল আলোর টুকরোটা দেখে অবাক হল মুজাফ্‌ফর, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সেটাকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যতবারই ধরে হাতের মুঠোয় কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না।

তখন শিক্ষক ঘরে ঢুকে বললেন:

'আঁধার কুঠরী থেকে আলোময় জগতে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে তোমার, জন্ম থেকে সে সূর্য দেখতে দেওয়া হয় নি তোমায় এবার তা দেখার সময় এসেছে, সময় এসেছে দেখার এই

জগত,লোকজন, যা কিছু জীবন্ত — আকাশের পাখী, পথের ঘোড়া আর মাঠেচরা গরুভেড়ার পাল দেখার।'

আঁধার কুঠরী থেকে বেরিয়ে এসে মুজাফ্‌ফর সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ, জলধারা দেখতে পেয়ে মনের দুঃখে কেঁদে ফেলল যে এত বিদ্যা শিখেও এতদিন পর্যন্ত সে এই আলোকোজ্জ্বল প্রাণবন্ত জগতের কথা জানত না কিছুই। তখনই সে নিজের বাড়ী, বাবার শাহর রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাইল যেদিকে দুচোখ যায়।

কিন্তু মুজাফ্‌ফরকে বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করে শিক্ষক তখনি বাদশাহর কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালেন, ছেলেটির বুদ্ধি-মনের হাজার প্রশংসা করতে লাগলেন।

তখন বাদশাহ গোটাশহরের লোকজনদের — সাত থেকে সত্তরবছরবয়স্ক সবাইকে — সমবেত হতে আদেশ দিলেন আর তাদের সামনে ঘোষণা করলেন যে মুজাফ্‌ফর পনরবছরবয়সেই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেছে তাকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করছেন।

বাদশাহ্‌র প্রাসাদ থেকে মুজাফ্‌ফরের বাড়ী পর্যন্ত গোটা রাস্তা গালিচা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, মহা আড়ম্বরে গানবাজনাসমেত ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হল বাবার কাছে। বাদশাহ তাকে নিজের পাশে বসালেন।

মুজাফ্‌ফর এবার থাকতে লাগল প্রাসাদেই।

একদিন সকালে মুজাফ্‌ফর দেখে সব লোক যাচ্ছে একই দিকে। এ কি ব্যাপার জানার ইচ্ছা হল তার, বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল সেকথা।

'আজ যে জুম্মাবার, বাছা,' বললেন বাদশাহ, 'যারই ঘরে কোন কিছুর অভাব হয়, সেই এইদিনে বাজারে গিয়ে তা কিনে আনে।'

মুজাফ্‌ফর তার বাবার অনুমতি চাইল বাজারে গিয়ে যা তার প্রয়োজন তা কিনে আনার। পকেটভর্তি করে অর্থ নিয়ে চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে চলল সে বাজারে।

বাজারে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করেও সে কেনার মত কিছু খুঁজে পেল না, ক্লান্ত হয়ে প্রাসাদে ফেরার পথ ধরল সে।

এমনসময় হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন লোক একটা রোগা বিশ্রীচেহারার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছে, ঘোড়াটা কেন কে জানে ভারী পছন্দ হল মুজাফ্‌ফরের, সঙ্গের সব টাকাকড়ি লোকটাকে দিয়ে ঘোড়াটা কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরে চলল সে। ঘোড়াটা দেখে বাদশাহ হেসে ফেলে বললেন:

'আমার ঘোড়ার কি কোন অভাব আছে ? এ বুড়ো ঘোড়াটা কেনার কি দরকার পড়ল তোমার ?'

কোন উত্তর না দিয়ে মুজাফ্‌ফর ঘোড়াটা নিয়ে গেল আস্তাবলে, আদেশ দিল তাকে ভাল করে খাওয়াতে।

বাদশাহ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। মুজাফ্‌ফর যেদিন থেকে প্রাসাদে বসবাস করতে লাগল সেদিন থেকেই হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল তার সৎমা। এবার সে বাদশাহর কানে

কানে বলতে লাগল যে এমনি আজেবাজে খরচ করে বাদশাহকে ফতুর করে দেবে ছেলে। বাদশাহ কিন্তু ছেলেকে বকাবকি করলেন না। তখন বাদশহর স্ত্রী ভাবতে লাগল কি করে সৎছেলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মদজাফ্‌ফরের ঘরের চৌকাঠ থেকে একেবারে মাঝখান পর্যন্ত একটা মস্ত বড় গর্ত খুঁড়তে আদেশ দিল সে। সে গর্তের মধ্যে ফেলে রাখল অনেক ধারাল হীরার টুকরো, আর ওপর থেকে গর্তটা ঢেকে দিল গ্যালিচা দিয়ে।

সে ভাবল যখন মদজাফ্‌ফর ঘরে ফিরবে, গর্তে পড়ে গিয়ে ধারাল হীরার টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরে যাবে, তখন ওপর থেকে তাকে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই আর কোন চিহ্ন থাকবে না।

প্রাসাদে ফিরে মদজাফ্‌ফর নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘোড়ার কথা মনে পড়ায় আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

ঘোড়ার সারা শরীর নোংরা মাটিমাখা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণচোখে সে তাকিয়ে রইল নিজের প্রভুর দিকে।

'ওরে ঘোড়া আমার, কি হল তোর ?' জিজ্ঞাসা করল মদজাফ্‌ফর।

'মদজাফ্‌ফর! তোমার সৎমা তোমাকে মেরে ফেলার মৎলব করেছে। শোন: যখন নিজের ঘরে ঢুকবে, তখন চৌকাঠ থেকে এক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়বে সেখানে যেখানে সৎমা বসে থাকবে তোমার অপেক্ষায়। যদি সৎমা জিজ্ঞাসা করে 'কেন অমন লাফ দিলি তুই ?' তার উত্তরে বলবে 'আমার মনে হল যেন যে আমি হলাম সেই মদরগীটা যেটাকে তুমি কাটতে চাও !'

ঘোড়ার কথায় মনে ভীষণ দুঃখ হল মদজাফ্‌ফরের, কিন্তু সে ঘোড়াকে কথা দিল সে যা বলছে তাই করবে।

ঘরে ঢুকে মদজাফ্‌ফর চৌকাঠ থেকে সেদিকে এক লাফ দিল যেখানে সৎমা বসেছিল।

'এদিকে এমন লাফ দিলি কেন তুই ?' অসন্তুষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করল সৎমা।'

'আমার মনে হল যেন আমি সেই মদরগীটা যেটাকে তুমি কাটতে চাও,' বলল মদজাফ্‌ফর।

সৎমা বুঝল মদজাফ্‌ফর তার চালাকি ধরে ফেলেছে আর মদজাফ্‌ফরও স্পষ্ট করে বুঝল যে ঘোড়া সত্যিকথাই বলেছে।

পরের দিন বাদশাহর স্ত্রী শুনে ফেলল মদজাফ্‌ফরের সঙ্গে তার ঘোড়ার কথাবার্তা, ধরে ফেলল যে ঘোড়াই মদজাফ্‌ফরকে সতর্ক করে দিয়েছিল, তাই ঠিক করল এবার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতে হবে।

সে ভান করল যেন তার অসুখ হয়েছে। বাদশাহ অনেক হাকিমকে ডেকে পাঠালেন কিন্তু তাদের কেউই ঠিক যেমন প্রয়োজন তেমন ওষুধ দিতে পাড়ল না। অসুখ কেউই সারাতে পারে না। শেষে বাদশাহকে সে বলল যে বাদশাহ যদি আদেশ দেন মদজাফ্‌ফরের ঘোড়াটা কেটে তার মাংসটা তাকে দিতে তবেই সে সেরে উঠবে।

প্রাসাদে ফিরে প্রতিদিনই মদজাফ্‌ফর প্রথমেই নিজের ঘোড়াকে দেখতে যায়।

সেদিন যখন বাদশাহ স্ত্রীকে কথা দেন যে মদজাফ্‌ফরের ঘোড়াটা কাটার আদেশ দেবেন

তখন মুজাফ্ফর আস্তাবলে ঢুকে দেখল যে তার ঘোড়াটার সারা গায়ে নোংরাকাদামাখা, মাথা নীচু করে বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি হল তোর, আমার প্রিয় ঘোড়া ?'

ঘোড়া বলল 'মুজাফ্ফর, তোমার সৎমা আমাকে কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে।' মুজাফ্ফরের মন খারাপ হয়ে গেছে দেখে বলল আবার 'ভেঙে পড়ো না, শোনো আমার কথা। সকালবেলায় যখন কসাই আসবে আমাকে কাটার জন্য নিয়ে যেতে তখন আস্তাবল থেকে বেরোবার সময় আমি একবার ডেকে উঠব। মাঝপথ পর্যন্ত গিয়ে আমি দ্বিতীয়বার ডেকে উঠব। তারপর যখন সকাই ছুরিতে শান দেবে তখন আমি ডাকব আর একবার। যদি আমার ডাক শুনে তুমি আমায় বাঁচাতে আস তো তোমার আর আমার দু'জনেরই প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু যদি তুমি এসে না পড় তো প্রথমে প্রাণ হারাব আমি আর তারপরে তুমিও।'

মুজাফ্ফর তাকে জিজ্ঞাসা করল তারপর তাকে কি করতে হবে।

'প্রথমে আমার পায়ের বাঁধন খুলে দেবে। তারপর আমার কেশর ধরে তোমার বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে অনুমতি চাইবে শেষবারের জন্য আমাকে নিয়ে শহরে ঘুরতে যাবার। বাবার অনুমতি পেলে আমাকে জিনলাগাম পরিয়ে বসবে আমার ওপরে। বাকী যা করার দরকার আমি করব।'

ভোরবেলায় মুজাফ্ফর বই নিয়ে পড়তে চলল শিক্ষকমশাইয়ের কাছে আর কান পেতে অপেক্ষা করে রইল কতক্ষণে ঘোড়ার ডাক শুনতে পায়। ঐ শোনা গেল ঘোড়ার ডাক, মুজাফ্ফর ছুটে যেতে চাইল ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু শিক্ষকমশাই তাকে যেতে দিলেন না।

দ্বিতীয়বার শোনা গেল ঘোড়ার ডাক আবারও শিক্ষকমশাই যেতে দিলেন না তাকে।

কিন্তু যখন তৃতীয়বার শোনা গেল ঘোড়ার ডাক তখন আর শিক্ষকমশাইয়ের অনুমতি না নিয়েই মুজাফ্ফর ঘর থেকে বেরিয়ে ছুট দিল ঘোড়াকে বাঁচাতে। দেখে, পাবাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তার ঘোড়া আর কসাই তার কাছে দাঁড়িয়ে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

মুজাফ্ফরকে দেখেই কসাই আর তার সাহায্যকারী তো ভয়ে পালিয়ে বাঁচল। মুজাফ্ফর তখন ঘোড়ার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তার কেশর ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে আর বলল:

'বাবা। আমার ঘোড়াকে নিয়ে শেষবারের মত শহর ঘুরে আসতে অনুমতি দাও, তারপর ওকে নিয়ে যা করার কোরো।'

ছেলেকে অনুমতি না দিয়ে পারল না বাবা।

ঘোড়াটাকে নাইয়ে-ধুইয়ে জিন পরিয়ে তার ওপর উঠে বসল মুজাফ্ফর, হাওয়ার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে চলল ঘোড়া। একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে গেল তারা। মুজাফ্ফর ঠিক করল আর ফিরে যাবে না নিজের শহরে।

তার বিশ্বস্ত ঘোড়া একটা উঁচু পাহাড়েব কাছে এসে থেমে পড়ে বলল:

'মুজাফ্ফর, এখানেই আমি তোমার কাছে বিদায় নেব। যদি আমি তোমার সঙ্গে থাকি তো আমাদের খুঁজে পাবে লোকে শীগগিরই। আমার মাথা থেকে একগোছা চুল ছিঁড়ে নাও। যদি

তোমার কোন বিপদ আসে বা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও কেন ব্যাপারে তো একটা চুল পড়িও, তখনি আমি এসে তোমায় সাহায্য করব।'

একা পথ চলতে লাগল মুজাফ্ফর। একটা উঁচু পাহাড় পেরিয়ে সে দেখতে পেল একটা ভেড়ার পাল চরছে। রাখালদের কাছে এগিয়ে এসে সে সসম্মানে অভিবাদন জানাল তাদের। তারা তাকে আদর আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করল সে কোথা হতে আসছে, কোথায় যাবে, মুজাফ্ফর তাদের বলল যতকথা সে বই পড়ে জেনেছে। রাখালদের এমন পছন্দ হয়ে গেল মুজাফ্ফরকে যে তারা তাকে থেকে যেতে বলল রাখালদের দলে। রাখালদের সঙ্গে থেকে, তাদের ভেড়া চরানোয় সাহায্য করে তাজা আলোবাতাসে থেকে মুজাফ্ফরের চেহারাটা হয়ে উঠল শক্তপোক্ত, চমৎকার, সুপুরুষালী।

কিছুদিন বাদে সে ভাবল সুখের সন্ধানে সে যাবে আরো দূরে। একজন রাখালের সঙ্গে পোশাক বদল করে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দিল সে।

অনেকক্ষণ চলার পর মুজাফ্ফর এসে উপস্থিত হল বিশাল এক নদীর তীরে, সেখানে ভেড়ান আছে এক জাহাজ ছাড়বার জন্য তৈরী হয়ে। মুজাফ্ফর উঠল জাহাজে, অমনি ছেড়ে দিল জাহাজটা। জাহাজটা নদীর মাঝ পর্যন্ত পেঁছান মাত্রই নদীর জল হঠাৎ ফুলেফেঁপে উঠল। জাহাজের লোকেরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। সেই ভীষণ কান্নাকাটি শুনে মুজাফ্ফর তাদের সেই কান্নার কারণ জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জানা গেল যে ঐ নদীতে আছে একটা বিশালাকায় মাছ, যে ঐ নদী দিয়ে যাওয়া সব জাহাজকেই গিলে ফেলে।

'গেলাম এবার আমরা!' চিৎকার করতে লাগল সবাই।

মুজাফ্ফরের সঙ্গে ছিল তার ধনুক। তীরধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল সে দানোটার অপেক্ষায়। মাছটা যেই জল থেকে মাথা তুলেছে মুজাফ্ফর অমনি তার চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল, লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধল তীরটা। এবার মুজাফ্ফর আর একটা তীর নিয়ে মাছের অন্য চোখে বিঁধিয়ে দিল। অন্ধ মাছটা ঝাঁপ দিল জাহাজের দিকে। লোকেরা আরও জোরে কান্নাকাটি করতে লাগল। তখন মুজাফ্ফর একের পর এক সব তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলল মাছটাকে।

রক্ষা পেয়ে আনন্দে সবার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, তারা আলিঙ্গন করতে লাগল মুজাফ্ফরকে। যখন জাহাজটা তীরে পেঁছাল সবাই তাকে নিজের নিজের বাড়ীতে আমান্ত্রণ জানাতে লাগল, কিন্তু মুজাফ্ফর বলল:

'আমি পথিক, আমাকে পথ চলতেই হবে।'

এগিয়ে চলল সে। অনেক পথ পেরিয়ে শেষে পেঁছাল এক সুন্দর শহরে। শহরের কাছে একটা চওড়া নালা বইছে। নালার কাছে গিয়ে তীরে একটা সিন্দুক পড়ে থাকতে দেখল মুজাফ্ফর।

'দেখি তো তো ভাগ্য পরীক্ষা করে,' বলে মুজাফ্ফর সিন্দুকটা ঠেলে জলে নামিয়ে উঠে বসল তাতে আর ভেসে চলল নালা বেয়ে।

জলের স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে সিন্দুকটা এসে পেঁছাল বাদশাহের বাগানে জল

এসে পড়ার নালীর কাছে। সিন্দুকটা এসে আটকে পড়ল নালীর মুখে, বাগানে জল আসা বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ো মালী দেখে বাগানে জল আসছে না, কি হয়েছে দেখতে এসে দেখে সিন্দুক একটা।

সিন্দুক খুলে মুজাফ্ফর বেরিয়ে এসে বুড়োকে অভিবাদন জানিয়ে মাফ চাইতে লাগল এমনি বাধা ঘটানয়।

বুড়োর তাকে পছন্দ হয়ে গেল, বুড়ো তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে খাইয়েদাইয়ে রেখে দিল নিজের কাছে।

এমনি ভাবে বুড়োকে বাগানের কাজে সাহায্য করতে করতে মুজাফ্ফরও কর্ক শহরের বাদশাহ্র বাগানের মালী হল।

বাদশাহ্র তিনটি কন্যা ছিল। সবার ছোটটির নাম — মালিকা দুনিয়া, মেজকন্যার নাম — ফাতিমা দুনিয়া আর বড়জনের নাম — গুলসুম।

তার সবাই সুন্দরী যেন পূর্ণিমার চাঁদ, সুন্দর গড়ন যেন ঝাউগাছের মত; ঠোঁটজোড়া যেন ফাটলধরা পেস্তা, চোখ যেন জামফলের মত, দাঁত ভারতের মুক্তোর মত সাদা। মুখমণ্ডল ঘিরে নেমেছে কোঁকড়ান চুলের গোছা।

প্রতিদিন মালীকে রাজার তিন মেয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হয় রাতে ফোটা ফুলের তিনটি তোড়া। এ কাজের ভার বুড়ো দিল মুজাফ্ফরকে, মুজাফ্ফর ফুলের তোড়া তৈরী করে ভালবাসা আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে। যাতে কারুর বিশেষ লক্ষ্য না পড়ে নিজের দিকে সেজন্য মুজাফ্ফর ছেঁড়া পোশাকআশাক পরে আর মাথার কোঁকড়ান চুলগুলোকে ঢেকে রাখে।

একদিন মুজাফ্ফর এমনভাবে ফুল সাজাল যে তোড়াটা কেমন আশ্চর্যভাবে যেন তার নিজের মতই হয়ে উঠল।

ফুলের তোড়াটা নিল মালিকা দুনিয়া। মুজাফ্ফরের তৈরী সেই তোড়াটা মনে ধরল তার।

কয়েকদিন বাদে মুজাফ্ফর দাঁড়িয়েছিল বাদশাহ্র বাগানে। ধারেকাছে কেউ নেই ভেবে সে মাথার ঢাকনাটা খুলল।

মালিকা দুনিয়া গাছের আড়াল থেকে দেখল তার অপূর্ব রূপ। আগে তাকে দেখেছে সে বিশ্রী চেহারায়।

মালিকা দুনিয়ার মনে ভালবাসা জাগল মুজাফ্ফরের প্রতি। রুগ্ন-মলিন হয়ে যেতে লাগল ক্রমে মেয়েটি, কিন্তু কাউকে বলতে পারে না তার মনের কথা।

দিনের পর দিন যায়। কাজ করে যায় মুজাফ্ফর, বুড়ো খুশী তার কাজে।

একদিন তিনবোনে বসে বিয়েথা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। তারা বলতে লাগল যে বাবা তাদের কথা কিছু ভাবছেন না, মনে করিয়ে দিতে হবে তাঁকে।

পরের দিন তারা প্রত্যেকে থালায় করে খরমুজ সাজিয়ে নিয়ে চলল বাবার কাছে। গুলসুম নিল একটা অতিপাকা খরমুজ, ফাতিমা — পাকা আর মালিকা দুনিয়া নিল আধপাকা খরমুজ।

খাবার সামনে এসে মেয়েরা নীচু হয়ে অভিবাদন করে বাবার সামনে খরমুজসমেত থালাগুলি রাখল।

বাদশাহ প্রতিটি খরমুজ থেকে এক টুকরো করে কেটে খেতে যাবেন এমন সময় তাঁর বৃদ্ধ, বুদ্ধিমান উজীর বলল:

'জাঁহাপনা! এ খরমুজগুলি খাবার জন্য আনা হয় নি।'

'তবে কি জন্য?' জিজ্ঞাসা করলেন বাদশাহ।

'আপনার জ্যেষ্ঠাকন্যার আনা অতিপাকা খরমুজ জানাচ্ছে যে গুলসুমের বেশ বয়স হয়েছে, বিয়েথা করে নিজের ঘরসংসার করার সময় হয়েছে অনেকদিনই। দ্বিতীয়াকন্যার আনা পাকা খরমুজ বলছে যে ফাতিমা দুনিয়ার কুমারী বয়স শেষ হতে চলল। আর আপনার কনিষ্ঠাকন্যার আনা খরমুজ বলছে যে যদিও তার বয়স অল্প তবুও বিয়েথা করে সংসার পাততে ইচ্ছা হচ্ছে তার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাদশাহ বললেন:

'নাঃ, করার আর কিছু নেই, বিয়ে দিতে হবে ওদের।'

লোকজনদের ডেকে জড় করতে আদেশ দিলেন বাদশাহ। তাঁর মেয়েরা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াল, প্রত্যেকের হাতে একটি করে আপেল ধরা, যাকে তাদের মনে ধরবে তাকে দেবার জন্য।

কর্ফ শহরের যুবকরা প্রাসাদের বারান্দার নীচ দিয়ে যেতে লাগল এক এক করে। গুলসুম নিজের স্বামীহিসেবে বেছে নিল উজীরের ছেলেকে, ফাতিমা দুনিয়ার পছন্দ হল বড় কাজীর ছেলেকে আর মালিকা দুনিয়ার কারোকেই পছন্দ হল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল সেইজনকে যাকে মন দিয়ে বসে আছে কিন্তু দেখতে পেল না তাকে।

শহরের সব যুবকই বারান্দার নীচ দিয়ে চলে গেছে। কেবলমাত্র কুৎসিত মালীটাই ঘরে বসেছিল, প্রাসাদের দিকে যাবার কথা মাথাতেই আসে নি তার। কিন্তু তাকেও বারান্দার নীচ দিয়ে যেতে বাধ্য করা হল। তার হাতেই তুলে দিল মালিকা দুনিয়া নিজের আপেলটা।

লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে গেল বাদশাহ্‌র। বাদশাহ্‌র পারিষদবর্গ হাসাহাসি করতে লাগল শাহজাদীর এমনি পছন্দ নিয়ে।

দুই জামাতাকে বাদশাহ দিলেন বাড়ীঘর, ভেড়ার পাল আর কুৎসিত মালীকে দিলেন কেবল একটা পুরান তেলের ঘানি। সেই ঘানিঘরের একদিকে তুলোর বীজ পিষে তেল বার করা হয় আর অন্যদিকটায় মালী থাকে তার স্ত্রীকে নিয়ে।

দিন, সপ্তাহ, মাস যায়। কারুরই জানতে ইচ্ছা হয় না মুজাফ্‌ফর আর মালিকা দুনিয়া কেমন আছে। তারা কিন্তু ভালই আছে।

একদিন বাদশাহ্‌র জামাতারা শিকারে যাবার আয়োজন করতে লাগল। মুজাফ্‌ফর তার স্ত্রীকে বাদশাহ্‌ফর তার স্ত্রীকে বাদশাহ্‌র কাছে যেতে বলল।

'আমার জন্য একটা ছুরি, লাগাম — জিনপুরান ঘোড়া আর তীরধনুক চেয়ে নিয়ে এস। আমিও ওদের দু'জনের সঙ্গে শিকারে যেতে চাই।' বলল সে স্ত্রীকে।

মালিকা দুনিয়া বাবার কাছে গিয়ে অভিবাদন করে স্বামীর অনুরোধ জানাল।

'তুই আর তোর হতকুচ্ছিৎ স্বামী দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!' রেগে বললেন বাদশাহ।

কিন্তু বৃদ্ধ, বুদ্ধিমান উজীর বলল:

'কথায় বলে: মরা নেকড়েরও চামড়াটা কাজে লাগে। এই জামাতাকেও শিকারে যেতে অনুমতি দিন, হয়ত সেও কিছু নিয়ে আসবে।'

উজীরের কথা শুনে বাদশাহ মুজাফ্‌ফরকে দিলেন একটা বুড়ো ঘোড়া, অসমান ছুরি, পুরান ধনুক আর শিকারে যেতে অনুমতি দিলেন।

কুৎসিত মালী সেই বুড়ো ঘোড়ায় জিনলাগাম পরিয়ে চলল শহরের মধ্যে দিয়ে। লোকে হাসাহাসি করতে লাগল তাকে নিয়ে, ছোট ছেলেমেয়েরা তার পিছনে ধাওয়া করতে লাগল আর ঢিল ছুঁড়তে লাগল তার দিকে তাকে রাগাবার জন্য। সেদিকে চোখকান না দিয়ে এগিয়ে চলল মুজাফ্‌ফর। শহর পেরিয়ে সে এসে উঠল এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটা গাছে বুড়ো ঘোড়াটা বেঁধে রেখে সে তাড়াতাড়ি তার প্রিয় ঘোড়ার চুল একগাছি পোড়াল। চুলটা পুড়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এসে দাঁড়াল ঘোড়া। দামী ঘোড়ার সাজ পরান, তার জিনের ওপর রয়েছে চমৎকার পোশাক। পোশাক বদল করে নিয়ে মুজাফ্‌ফর ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহ্‌র জামাতাদের পিছন পিছন চলল।

তাদের কাছে এসে পেঁ'ছে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে চলল তাদেরও আগে। তাকে চিনতে পারল না বাদশাহ্‌র জামাতারা, তারা ভাবল:

'কে এই চমৎকার পোশাকপরা, চমৎকার সাজান ঘোড়ায় চড়া রূপবান যুবক?'

পথে মুজাফ্‌ফর কোন জানোয়ার বা পাখী কিছুই দেখতে পেল না। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার কাছে পেঁ'ছে গেল সে অবশেষে। উপরদিকে তাকিয়ে মুজাফ্‌ফর দেখতে পেল পাহাড়ের ওপরে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

'ওহে, বীরযুবক, কি চাই এখানে তোমার?' জিজ্ঞাসা করল বৃদ্ধ।

'আমি এসেছি শিকার করতে।' উত্তর দিল মুজাফ্‌ফর।

'তাহলে এখানে উঠে এস!' বলল বৃদ্ধ।

ঘোড়া ছুটিয়ে এক মুহূর্তেই মুজাফ্‌ফর পাহাড়ের চূড়ায় পেঁ'ছে গেল। নীচু হয়ে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে বলল নিজের ব্যর্থ শিকার-অভিযানের কথা।

'এই হরিণগুলোকে শিকার কর,' বলল বৃদ্ধ মুজাফ্‌ফরের দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে মৃদু হেসে।

চারটে হরিণকে চটপট মেরে ফেলে মুজাফ্‌ফর তাদের ছাল ছাড়াতে লাগল।

'মাংস তেতো, কিন্তু পাকস্থলী সুস্বাদু', বলল বৃদ্ধ অর্থপূর্ণভাবে।

এমন সময় বাদশাহ্‌র দুই জামাতা সেই পাহাড়ের কাছে এসে পেঁ'ছাল। পাহাড়ের ওপরে ওঠার চেষ্টা করল তারা কিন্তু পারল না।

'চোখ বন্ধ কর তোমরা।' বৃদ্ধ তাদের বলল।

পরমুহূর্তে তাদেরকে ওপরে তুলে আনা হল। বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে তারাও বলল ব্যর্থ শিকারঅভিযানের কথা। চুপ করে রইল বৃদ্ধ। নিহত হরিণগুলোকে দেখে জামাতাদের একজন সেই অজানা যুবককে ধরাধরি করতে লাগল অন্ততঃ একটা হরিণের মাংস তাদের বিক্রী করে দেবার জন্য।

'চারটে হরিণের মাংসই নাও তোমরা, আমার জন্য রেখে দাও কেবল পাকস্থলী, মাথা আর পাগুলো,' বলল মুজাফ্ফর।

জামাতারা খুশী হয়ে মাংস নিয়ে চটপট ফিরে চলে গেল।

হরিণের পাকস্থলী, মাথা আর পাগুলো থলিতে রেখে জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে মুজাফ্ফর বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠল। একটু পরেই সে বাদশাহ্‌র দুই জামাতার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে তাকে লক্ষ্য করে দুই জামাতা কিছুতেই ভেবে বার করতে পারল না কে ঐ অজানা বীর যুবক, তার ঘোড়া, দামী ঘোড়ার সাজ আর চমৎকার দামী পোশাকআশাক দেখে হিংসা হল তাদের মনে।

মুজাফ্ফর এদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছাল সেখানে যেখানে সে রেখে গিয়েছিল বাদশাহ্‌র ঘোড়াটাকে, থলিটা ঝুলিয়ে নিল সেই ঘোড়াটার পিঠে, পোশাক বদল করে নিজের প্রিয় ঘোড়ার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর দিকে চলল। তার থলিতে একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে পড়তে লাগল হরিণের পাকস্থলীর ভিতরের সবকিছু। যখন শহরে এসে ঢুকল মুজাফ্ফর তখন শহরের নিষ্কর্মা লোকেরা চীৎকার করে বলতে লাগল:

'বাদশাহ্‌র জামাই শিকার করে গোবর নিয়ে ফিরছে!'

বাড়ীতে এসে মুজাফ্ফর স্ত্রীকে বলল হরিণের পাকস্থলী, পাগুলো আর মাথা রান্না করতে। বাটীর মধ্যে প্রথমে সে রাখল হরিণের পাকস্থলীর গোবর খানিকটা, তার ওপরে রুটি টুকরো টুকরো করে রাখল, তার পর বাটীটা কানায় কানায় ভরে দিল হরিণের পাকস্থলী, পা আর মাথা দিয়ে রান্না করা ঝোলে। স্ত্রীকে বলল আলাদা করে একটা রুটীর ওপর পাগুলো আর মাথাটা রাখতে, এমনিভাবে তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে ঐসব খাবার।

বাদশাহ্‌র অন্য দুই জামাই হরিণের মাংস দিয়ে বেশ ভাল করে ঝোল রান্না করে সসম্মানে নিয়ে এল বাদশাহ্‌র কাছে। বেশ জাঁক করে বলতে লাগল তারা শিকারের কথা, মাংসটা যে শিকারীর কাছে কিনেছে তা স্বীকার করার কথা তাদের মনেও এল না।

প্রিয় জামাতাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন বাদশাহ। কিন্তু যখন বড় জামাইয়ের রান্না চেখে দেখলেন তিনি সে মাংস তাঁর কাছে মনে হল তেতো। অন্যজনের রান্নাও মনে হল তেতো, বিস্বাদ। বাদশাহ্‌র এমনকি বমি পেয়ে গেল তাদের রান্না চেখেঃ মিথ্যা দিয়ে প্রস্তুত সেই খাবার এমনই তেতো মনে হল যে দূর করে দিতে বললেন তিনি সে খাবার।

মালিকা দুনিয়া এবার খাবার সঙ্গে নিয়ে এসে বাবাকে বলল চেখে দেখতে। বাদশাহ বললেন:

'আমার প্রিয় জামাতারা এমন রান্না করে এনেছে। যে অখাদ্য, তেতো! তোমরা আমাকে আর কি খাওয়াতে পার? ওসব নিয়ে চলে যা!'

কিন্তু বৃদ্ধ উজীর বাদশাহকে বলল:

'জাঁহাপনা, যে কোন খাদ্যদ্রব্যকেই সম্মান করা উচিত, এমন করে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়! একটুখানি নিয়ে চেখে দেখুন, তারপরে বলবেন।'

বাদশাহ বুদ্ধিমান উজীরের কথা কখনও অমান্য করতেন না। মালিকা দুনিয়ার আনা মাংসের ঝোল — সত্য দিয়ে তৈরী খাবার — চেখে দেখলেন। প্রথমে এক চামচ ঝোল খেলেন, তারপর আর এক চামচ, তারপর আরও এক চামচ — এমনি ভাল লাগল সে রান্না। খেয়েই চললেন বাদশাহ যতক্ষণ না বাটিতে গোবর দেখতে পেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তার, চীৎকার করে বললেন:

'বাছা আমার, তোর রান্না তো আমার বেশ ভালই লাগল। কিন্তু এর ভিতরে গোবর এল কোথা থেকে?'

মালিকা দুনিয়া বলল: 'বাবা গো, গরুভেড়ার সঙ্গে একসঙ্গেই তো থাকি আমরা, আমাদের ঘরেদোরে চারদিকেই গোবর, তাই খাবারের মধ্যেও এসে পড়েছে।'

লজ্জা হল বাদশাহের, কুচ্ছিৎ জামাইকে একটা ভাল বাড়ী দিতে আদেশ দিলেন অবশ্য অন্য দুই জামাইকে যেমন দামী বাড়ী দিয়েছেন তেমনটি নয়।

কর্ফ শহরের পাশের শহরের বাদশাহ ছিলেন তোরজ, যিনি একসময় মালিকা দুনিয়ার পাণিপ্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।

তোরজ-বাদশাহের কানে এল যে মালিকা দুনিয়ার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক হতকুচ্ছিৎ মালীর সঙ্গে। অপমানিত, ক্ষুব্ধ বাদশাহ সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করলেন, এত সৈন্য সংগ্রহ করলেন যেন শীতে তুষারপাতের মত, সেই বিশাল সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন কর্ফ শহরের বিরুদ্ধে। কর্ফের বাদশাহ ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, প্রিয় জামাতাদের ডেকে তিনি বললেন:

'শোন হে, তোমরা নিজেদের স্ত্রী, মা, মাতৃভূমি রক্ষা কর!'

জামাই দু'জন প্রথমে ভয়ে যুদ্ধে যেতে রাজী হল না। কিন্তু গোটা কর্ফ শহরের লোকেরা রুখে দাঁড়িয়েছে তোরজের বিরুদ্ধে। তাই লুকিয়ে থাকতে লজ্জা হল জামাইদের। ওদিকে মুজাফ্ফর শত্রুর আক্রমনের খবর শুনে স্ত্রীকে বলল:

'এখুনি বাবার কাছে গিয়ে আমার জন্য চাও একটা ঘোড়া, তলোয়ার আর তীর-ধনুক আমি যুদ্ধে যাব।'

মালিকা দুনিয়া বাবার কাছে গিয়ে জানাল স্বামীর অনুরোধ। কিন্তু বাদশাহ হা হা করে হেসে বললেন:

'তোর স্বামীকে গিয়ে বল একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ঘুমোক পড়ে পড়ে। যুদ্ধে যাবে, হুঁঃ!'

মালিকা দুনিয়া স্বামীকে এসে জানাল বাবার উত্তর।

তখন মুজাফ্‌ফর ঘানির বুড়ো ঘোড়াটাকে নিয়েই গেল উঁচু পাহাড়টার কাছে। সেখানে সে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নিজের বিশ্বস্ত প্রিয় বন্ধুর একগাছি চুল পোড়াল। অমনি উড়ে এল দামী সাজ পরান তার দ্রুতগামী ঘোড়া, দামী যুদ্ধের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র সব নিয়ে।

দামী বর্ম পরে, হাতে ঢাল — তলোয়ার আর কাঁধে তীর-ধনুক নিয়ে মুজাফ্‌ফর রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছাল। সেই অজানা বীরকে দেখে মুগ্ধ হল সবাই আর নিজের সৈন্যদল নিয়ে সে এমন যুদ্ধ করল যে শত্রুদল মুহূর্তখানেক বাদেই চম্পট দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তোরজ-বাদশাহ দেখলেন যে জয়দেবী তাঁর হাত ছাড়া হতে চলেছে তখন নিজে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে ঐ বীরের দিকে ছুঁড়লেন একটি তীর। তীরটা এসে লাগল বীরের ডান হাতে।

কর্কের বাদশাহ দেখলেন যে ঐ বীর যুবকটি আহত, তাড়াতাড়ি তার কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নিজের রেশমী রুমালটি বেঁধে দিলেন তার ক্ষতস্থানে। আবার লড়তে আরম্ভ করল বীর যুবকটি।

যুদ্ধে কর্কের সৈন্যদলের জয় হল। যুদ্ধশেষে বীর যুবকটি গাঢাকা দিল। সন্ধ্যার আঁধার নামলে মুজাফ্‌ফর ঘরে স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে ঘুমোতে শুয়ে পড়ল।

মালিকা দুনিয়া কিন্তু জানে না যে তার স্বামী অমন বীরের মত যুদ্ধ করেছে। যখন সে দেখল তার স্বামীর হাতে বাদশাহ্‌র রক্তমাখা রুমালটা তখনই সে বুঝল যে তোরজ বাদশাহকে পরাজিত করেছে যে বীর সে হল তার স্বামীই। বিস্ময়ে, আনন্দে বোনেদের কাছে ছুটে গেল সে একথা জানাতে।

কিন্তু বোনেরা বিশ্বাস করল না তার কথা, হাসাহাসি করল তাকে নিয়ে তারা।

জয় উৎসব পালন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হল শহরের সবাইকে। সমবেত সবার মধ্যে বাদশাহ খুঁজতে লাগলেন সেই বীর যুবককে যে শহরকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ভোজসভায় সে আসে নি।

ভোজসভা শেষ হবার মুখে কেবল প্রাসাদে এল মালিকা দুনিয়ার স্বামী, দামী জরির পোশাক পরনে, মাথার কোঁকড়ান চুলের ওপর পরা মালিকা দুনিয়ার তৈরী চমৎকার ফুলতোলা টুপী ডান হাতে রেশমী রুমাল জড়ান। বাদশাহ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর দুচক্ষের বিষ, হতকুচ্ছিৎ ঐ জামাই হল সেই বীর যে শহর রক্ষা করেছে।

কিন্তু যে রেশমী রুমালটা গতকাল তিনি নিজে তার হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এ সত্যি।

বাদশাহকে স্বীকার করতে হল যে তাঁর কনিষ্ঠাকন্যা তাকে স্বামী হিসাবে বেছে নিয়ে ভুল করে নি, আবার নতুন করে তাদের বিয়ের উৎসব করা হল।

কিমিওগার

এক বাদশাহ্‌র কোন ছেলেমেয়ে ছিল না, স্ত্রীকে সর্বদা তিনি বলতেন:

'ছেলের জন্ম দেবে তুমি, যদি মেয়েব জন্ম দাও তো তোমাকে ঐ মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কেটে ফেলার আদেশ দেব।'

কিন্তু বাদশাহ্‌র এমনি শাসানিতে বিশ্বাস হয় না তাঁর স্ত্রীর, তাই মন খারাপ করে না সে হাসিখুশী আমোদ-আহ্লাদে ডুবে থাকতে সে ভালবাসে। বিশেষ করে ভালবাসে সে নৌকায় চড়তে। একদিন তার লোকজনেরা তাকে নৌকায় নিয়ে বেরিয়েছে নদীতে, হঠাৎ নৌকাটা পড়ল ঘূর্ণির মাঝে। ভয়ে জ্ঞান হারাল বাদশাহ্‌র স্ত্রী। নিজের শয়নকক্ষে চোখ মেলেই আবার সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির কথা মনে পড়ল তার। স্বামীকে সে বলল:

'নদীটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার আদেশ দিন আর ঐ ঘূর্ণির জায়গাটা মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরিয়ে দেওয়া হোক যেন ওখানে একটা পাহাড়মত হয়। সেই পাহাড়ের ওপরে একটা উঁচু প্রাসাদ তৈরী করাবেন, সেখান থেকে আমি চারপাশের শোভা দেখব।'

'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমি,' বললেন বাদশাহ, 'কিন্তু এর বদলে তুমি আমার জন্য ছেলের জন্ম দেবে। যদি মেয়ে হয় তবে ঐ পাহাড়ের ওপরেই তোমার আর তোমার মেয়ের সমাধি গড়ার আদেশ দেব আমি।'

বাদশাহ্‌র এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কথা শুনে তাঁর স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল। অসুখে পড়ল সে, শয্যাশায়ী হয়ে রইল বেশ কিছুদিন। হাকিমবদ্যি ডেকে পাঠান হল তার কাছে।

তখন একজন বুড়ী বাদশাহ্‌র স্ত্রীকে বলল যে তার মেয়ে হবে।

'এমনি কর যেন আমার ছেলে হয়,' বলল তার উত্তরে বাদশাহ্‌র স্ত্রী।

বাদশাহ্‌র আদেশে নদীর ঘূর্ণির কাছে জড় হল প্রচুর লোক কাজ করার জন্য — ছেলে,

মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী। পিঁপড়ের দলের মত লোকে ঘূর্ণিটাকে ঘিরে ফেলে লড়তে লাগল তার সঙ্গে। নদীর মধ্যে তারা এনে ফেলতে লাগল পাথর, গাছের গুঁড়ি, ডাল, কাঠকুটো আর মাটি চাপা দিতে লাগল।

সেই বুড়ীটা ওদিকে লোকজনের ভীড়ের মাঝে খুঁজে বেড়াতে লাগল মেয়েদের মধ্যে কেউ আসন্নপ্রসবা আছে নাকি। সবাইকে বলতে লাগল যে বাদশাহ আর বাদশাহ্‌র স্ত্রী দু'জনেই জন্ম নিয়েছে তার উপস্থিতিতেই, সে খুব দক্ষ দাই।

সেই নদীর কাজে লেগেছিল এক বুড়ো রুটিওয়ালা, তার ছেলে আর ছেলের বৌকে নিয়ে। রুটিওয়ালার ছেলে লিখতে পড়তে শিখেছে, অনেক বই পড়েছে সে। বই পড়ে সে শিখেছে নানারকম ওষুধবিষুধ তৈরী করতে, বিভিন্ন ফুলের রং তৈরী করতে, ইতিমধ্যেই কিমিওগার বা অপরসায়নবিদ হিসাবে নাম হয়েছে তার। কিমিওগারের স্ত্রীমাথাভরা চুল, বড় বড় কালো চোখ, দীর্ঘ আঁখিপল্লব, সবকিছু মিলিয়ে যেন আনার কলির মতই সুন্দরী। যদিও কিমিওগার সবরকমে চেষ্টা করত তার তরুণী স্ত্রীর কষ্ট কমাবার জন্য, কিন্তু বাদশাহ্‌র কর্মচারী তাকেও বাধ্য করে ভারী ভারী পাথর আর কাঠ বহতে।

গ্রীষ্মের সূর্যের তাপে জ্বলছে চারদিকে, লোকেরা কাজ করতে করতে ঘেমে নিয়ে উঠেছে। হঠাৎ কিমিওগারের স্ত্রীর শরীর খারাপ বোধ হল, মুখ মলিন হয়ে গেল। যুবক কিমিওগার আর তার বাবা ছুটে গেল বেচারীর কাছে, তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল তারা। তাদের চারপাশে লোক জড় হল। সে জায়গায় কাজ থেমে গেল। বাদশাহ্‌র কর্মচারী প্রচন্ড রেগে সেদিকে ছুটে এসেই কি হয়েছে না জেনেই মাটিতে শুয়ে থাকা মেয়েটিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করল। প্রচন্ড ক্ষেপে গিয়ে কিমিওগার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর কিন্তু কিমিওগারও খেল চাবুকের বাড়ি।

এমন সময় সেই বুড়ী দাই এসে বলল যে মেয়েটিকে তখুনি বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রাসাদ থেকে সামান্য দূরেই তাদের বাড়ী, জ্ঞানহারা অবস্থাতেই মেয়েটিকে বাড়ীতে আনা হল। আর বাড়ীতে একবার জ্ঞান ফেরে একবার জ্ঞান হারায় এমনি অবস্থায় একটি ছেলের জন্ম দিয়ে তখুনি মারা গেল।

কিমিওগারের বাড়ী থেকে যেই বেরিয়েছে বুড়ী দাই অমনি দেখা বাদশাহপত্নীর পাঠান লোকের সঙ্গে। ছুটে গিয়ে বাদশাহপত্নীর যন্ত্রনাকাতর চীৎকার শুনে সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলল। বাদশাহপত্নী একটি মেয়ের জন্ম দিল।

একটু পরেই বুড়ী একটা পুঁটুলি হাতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে চলল কিমিওগারের বাড়ীর দিকে। মেয়ের বদলে কিমিওগারের ছেলে নিয়ে তাকে বলল বাদশাহপত্নীর আদেশ সে যেন একথা কাউকে না বলে।

বুড়ী কিমিওগারকে বলল 'এ হল বাদশাহ্‌র মেয়ে। এই অর্থ দিয়ে গরু কিনবে। মেয়েকে গরুর দুধ খাইয়ে বড় করে তোল।'

বলে বুড়ী আবার পুঁটুলি হাতে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেল।

মনের দুঃখে কিমিওগার মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল, মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল আর নদী ভরাট করার আর সব লোক জড় করার ঐ অদ্ভুত খেয়ালের জন্য গালিগালাজ করতে লাগল বাদশাহ্‌কে। বাদশাহ্‌র যে কর্মচারী তার স্ত্রীকে মেরে ফেলল তাকে অভিশাপ দিল সে, বাদশাহপত্নীর প্রতি ঘৃণায় জ্বলতে লাগল সে তার সন্তান কেড়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কাউকে মনের দুঃখের কথা খুলে বলতে পারে না। সেই দিন থেকে সে নদীর কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিল, নির্জনে বসে জ্ঞানবিজ্ঞান শেখায় আরও মন দিল। ঠিক করল যে পৃথিবীতে সবকিছু জানাতে হবে আর ছেলেকে ফিরে পাবার পথও খুঁজে পেতে হবে তাকে।

ছেলে পাওয়ার আনন্দে বাদশাহ এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন। ছেলের নাম রাখলেন দিলশদ।

নদীর ঘূর্ণির জায়গায় একটা বড় ঢিপি তৈরী হল, তার ওপরে একটা উঁচু প্রাসাদ তৈরী করার আদেশ দিলেন বাদশাহ যাতে তাঁর স্ত্রী সেখান থেকে চারপাশের শোভা উপভোগ করতে পারেন।

বাদশাহপত্নী আগের মতই সাজগোজ, আমোদ প্রাসাদে মগ্ন থাকে। ছেলেকে বড় করে তোলার ভার দিয়ে রেখেছে ধাইদের ওপর।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ছেলেকে ভালবাসেন বাদশাহ, আদেশ দিয়েছেন যেন তার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ না থাকে। কিন্তু তিনি নিজেও সবসময় থাকেন না প্রাসাদে, তার প্রিয় বাজপাখী নিয়ে শিকারে গিয়ে কয়েকদিন ধরে প্রাসাদে ফেরেন না।

ছোটবয়স থেকেই দিলশদ লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে। বই পড়তে খুব ভালবাসে সে। শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করতে অনুমতি দিয়েছেন তার বাবা, কয়েকজন শিক্ষকের বাড়ীতে সে নিজে যেত পড়তে।

কিমিওগারের বাবার নাম ছিল চমৎকার, সুস্বাদু রুটি তৈরী করায়। বিভিন্ন জীবজন্তুর আকারের সুস্বাদু মিষ্টি রুটি কেউ আর তৈরী করতে পারে না তার মত। চমৎকার সুস্বাদু সেই মিষ্টি রুটিগুলি আকর্ষণ করত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের।

যেখানেই যাক না কেন দিলশদ তাকে যেতে হত রুটিওয়ালার দোকানের পাশ দিয়ে, আর তারও অন্যান্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতই ভাল লাগত ঐ মিষ্ঠি রুটিগুলি।

দিলশদকে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেই বুড়ো রুটিওয়ালার মুখে ফুটে ওঠে অপূর্ব স্নেহমাখা হাসি। ছেলেটির মুখ থেকে চোখ সরে না বুড়োর আর হাতগুলো বার করে আনে আরও সুন্দর আরও সুস্বাদু রুটি।

বুড়ো রুটিওয়ালাকে ভাল লাগে শাহজাদারও তার দোকানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। দোকানের ভেতরে কখনও কখনও দিলশদ লক্ষ্য করেছে একজন পুরুষমানুষ ও একটি বাচ্চা মেয়েকে। পুরুষমানুষটি তার দিকে তাকিয়ে থাকে আবেগভরা দৃষ্টিতে কিন্তু তার মুখেচোখে কেমন যেন হতাশ-মরীয়া দৃষ্টি আর চট করে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় সে।

দিলশদ বয়সের তুলনায় বাড়তে থাকে খুব তাড়াতাড়ি। লম্বা বাড়ন্ত গড়ন তার, পনরবছর বয়সেই তাকে মনে হয় যেন এক যুবক।

একদিন শিক্ষকমশাইদের কাছে পড়ে ফেরবার সময় সে দেখে প্রাসাদের কাছে অনেক লোক জড় হয়েছে দেখে লোকে জড় হয়ে দেখছে প্রায় প্রতিত্যকারের গরুর মত আকারের একটি সোনার গরু। গরুটার মালিক সারা অঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা, মুখে কালো দাড়ি, দিশশদকে বলল:

'সোনার গরুটা বিক্রী করছি।'

'এ খেলনাটা কেবল বাদশাহ্‌র ছেলেকেই মানায়!' ভীড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল।

গরুটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে দারুণ ভালো লেগে গেল দিলশদের। গরুটার সবকিছুই সত্যিকারের মতন: মাথার আকার, নোয়ান ঘাড়ের খাঁজগুলি, সোনার ঝিলিক ছড়ান নধর দেহ, সবই।

'যে এমন অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি করেছে তার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া উচিত!' অভিভূত হয়ে বলল দিলশদ। 'খাজাঞ্চি, এই সোনার গরুটা কিনে নাও, তা সে যত দামেই হোক না কেন!'

তার মনে হল যে গরু বেচা লোকটা যে খুব খুশী হয়েছে যে তার শিল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাই গরুর দাম সে কমিয়ে বলল।

গরুটাকে নিজের ঘরে রাখতে বলল দিলশদ। সারাদিন ধরে গরুটাকে দেখে দেখে আর আশ মেটে না তার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সুদক্ষ শিল্পীর চেহারা আর মনে মনে হাজার প্রশংসা করে তাকে।

সোনার গরুটা যে বিক্রী করেছিল সে হল দিলশদের বাবা কিমিওগার। ছেলে যতদিনে বড় হয়েছে ততদিনে বাবা নিজের কাছে আরও অনেক সাফল্য পেয়েছে। গলান টিন দিয়ে বিভিন্ন আকারের জিনিস তৈরী করতে শিখেছে, গলান লোহা দিয়ে তৈরী করতে শিখেছে সোনার রং। দুষ্প্রাপ্য লতাপাতা দিয়ে এমন একটা ওষুধ তৈরী করেছে যা জীবন্ত প্রাণীকে অদৃশ্য করে দিতে পারে কিন্তু অদৃশ্য প্রাণীকে আবার দৃশ্য করার জন্য ওষুধ কিছুতেই তৈরী করতে পারছে না। প্রাচীন পুঁথিগুলিতে সে পড়েছে যে এমন ওষুধ তৈরীর জন্য যে লতাপাতা প্রয়োজন জন্মায় উঁচু বাদাখশান পাহাড়ে। তাই সে ঠিক করল বাদাখশান পাহাড়ে যাবে সেই লতাপাতা খুঁজতে।

সেই দূর পথে রওনা দেবার আগে কিমিওগার টিন গলিয়ে একটা গরু তৈরী করল, সোনার রঙে রং করল সেটাকে তারপরে নিয়ে চলল ঠেলাগাড়ীতে করে সেটাকে বিক্রী করার জন্য। বাদশাহ্‌র প্রাসাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে বাদশাহ্‌র ছেলেকে বা প্রাসাদের আর কারুর কাছে গরুটা বিক্রী করার আশায়।

দিলশদ বরাবরই রাত অবধি জেগে বসে বসে বই পড়ে। তার আদেশ কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে, না ডাকলে যেন কেউ না আসে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দিলশদ দেখে কে যেন তার বইগুলোকে চমৎকার ভাবে

গুছিয়ে রেখেছে আর কালকে দিলশদের না ছোঁওয়া থালাভরা পোলাও থেকে অর্ধেকটা খেয়েছে।

দাসকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল:

'কে রাতের বেলায় আমার ঘরে ঢুকেছিল ?'

'এতক্ষণ পর্যন্ত কেউই ঢোকে নি।' বলল দাসটি।

অবাক হল দিলশদ। গরুটার কাছে এসে চারপাশ থেকে তাকে লক্ষ্য করল। ঝকঝকে সোনার রঙের গরুটা অনড় দাঁড়িয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে যে সেটি প্রাণহীন।

কাউকে কিছু জানতে দিল না দিলশদ, সেদিন সন্ধ্যায় সে তিনটি পদের খাবার আনতে বলল নিজের জন্য, কিন্তু ছুঁল না কিছুই। ঘুমাতে যাবার সময় সে দাসকে আদেশ দিল যেন কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

পরের দিন সকালে সে আবার দেখে প্রতিটি খাবার থেকেই খানিকটা করে কমে গেছে, দাসও আবার নিশ্চয় করে বলল তার ঘরে কেউ ঢোকে নি। এবারে টেবিলের বইগুলোই যে কেবল গুছিয়ে রাখা হয়েছে তা নয়, সারা ঘরেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

তৃতীয় রাতে দিলশদ কয়েক রকমের খাবার আনতে বলল তার জন্য, কিন্তু নিজে ছুঁল না কিছু, আর প্রতিজ্ঞা করল যে আজ কিছুতেই ঘুমোবে না সে, ধরবে গোপন অতিথিকে।

অনেক রাত অবধি পড়ল, লিখল সে, তারপর যখন ঘুম পেতে লাগল তখন ঠাণ্ডা জলে মুখচোখ ধুয়ে নিল। মাঝরাত পেরিয়ে গেল। মোরগগুলো ভোর হবার কথা ঘোষণা করল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঘরে কাউকে দেখা গেল না। দিলশদ যখন বুঝল যে আর জেগে থাকতে পারছে না সে কিছুতেই তখন ছুরি দিয়ে আঙুল কেটে ক্ষতস্থানে নুন ছিটিয়ে দিল। যদিও বিছানায় গিয়ে শুল সে কিন্তু ঘুমোতে পারল না কারণ ক্ষতস্থানটা জ্বলছে।

ঘরে অন্ধকার, কেবল এক কোনে ছোট্ট একটা প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে।

হঠাৎ সোনার গরুর পেটের কাছে একটা দরজা খুলে গেল একটা ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে, মেয়েটির ম্লান মুখে বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। মেয়েটি প্রথমে দিলশদের বিছানার কাছে এসে ভালো করে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল সে যে ঘুমোচ্ছে তা নিশ্চিত বুঝে খাবারের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। সব পদের থেকে খানিকটা করে খেয়ে তারপর ঠাণ্ডা চা খেল এক পেয়ালা। তারপর এগিয়ে গেল দিলশদের বইগুলোর দিকে। তখন দিলশদ লাফিয়ে উঠে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'কে তুমি, কেমন করে এখানে এলে ?' জিজ্ঞাসা করল সে।

ভয়ে মলিন হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। দিলশদের কথামত গালিচার ওপর বসে পড়ে মেয়েটি বলল:

'আমার নাম নিগিনা। সোনার গরুর মধ্যে থাকি আমি।'

আস্তে আস্তে মনে জোর এনে নিগিনা দিলশদকে বলল যে তার মা নেই — তাকে জন্ম

দেবার সময় মারা যায়। যখন বাদশাহ্‌র নতুন প্রাসাদটা তৈরী তখন তদারককারী চাবুক মেরে আধমরা করে দেয় তাঁকে।

'তার মানে তুমি আর আমি একবয়সী। তোমার বাবা কে ?' জিজ্ঞাসা করল দিলশদ।

'আমার বাবা কিমিওগার,' বলে নিগিনা দিলশদের সৌহার্দ্যে ভরসা পেয়ে বলল যে বাবা কি করে, বলল যে দুষ্প্রাপ্য লতাপাতা খুঁজতে পাহাড়ে গিয়েছে। দুঃখিত মনে মেয়েটি বলল তার দাদু, যে রুটি বিক্রী করত, মারা গেছে।

'তোমার দাদুকে জানি আমি, কতবার মিষ্টি রুটি কিনেছি তাঁর কাছে।' বলল দিলশদ। এমন রহস্যময় উপায়ে তার ঘরে আবির্ভূত হওয়া মেয়েটিকে ভাল লেগে গেছে দিলশদের।

'আমাকে যে কারুর কাছে রেখে যাবে এমন কেউ নেই,' বলে চলল নিগিনা, 'তাই বাবা ঠিক করলেন একটু সোনার গরু তৈরী করে। সেটাকে বিক্রী করবে রাজপ্রাসাদের কারো কাছে। আমাকে বললেন: 'গরুই নিজের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তোকে। হয়ত এই সোনার গরুটা তোর জীবনে সুখ এনে দেবে।' লোকজনের সামনে ওঠা থেকে বেরোতে মানা করে দিয়েছে বাবা, বলেছে তার ফিরে আসার পর্যন্ত আমি যেন লুকিয়ে বসে থাকি ওটার মধ্যে।'

'সোনার গরুর মধ্যে সারাদিনরাত বসে থাকা তো কষ্টকর হবে,' বলল দিলশদ।

'না, আমাকে সবকিছু সহ্য করে বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে। বাবা আমায় বলেছেন যে গরুটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারি আমি কেবল তখনই যখন গরুটা ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে আরও ভালো হবে।'

নিগিনা দিলশদকে অনুরোধ করতে লাগল যেন কাউকে সে বলে না তার কথা। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে গরুর ভিতর থাকলে তার বাবা তাকে খুঁজে পাবে ঠিক, আর গরুটা ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা তেমন সহজ নয়।

'তুমি কাউকে হয়ত বিক্রী করে দেবে গরুটা, কেবল তোমার পায়ে পড়ি কখনও কাউকে বলো না যে আমি থাকি গরুর মধ্যে,' অনুরোধ করল মেয়েটি।

'কি বলছ ?! সোনার গরুটা কাউকেই বিক্রী করব না আমি, আর তোমায় কথা দিচ্ছি আমি যদি তুমি নিজেই গরুটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না চাও, তোমার কথা কাউকেই বলব না আমি।' আশ্বাস দিল দিলশদ।

প্রাসাদে সবাই জানে যে শাহজাদা সবসময়ই নিজের পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। এমনকি খুশীই সবাই যে কাউকে বিরক্ত করে না সে। বাদশাহ্‌র স্ত্রী আগের মতই আমোদ-আহ্লাদে মেতে থাকে, ছেলে সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই তার। কেবল মাঝেমধ্যে ছেলেকে কাছে ডেকে হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা করে কিন্তু ছেলের ঘরে পা দেয় না মোটেই মাতৃস্নেহ ছাড়াই বড় হতে লাগল ছেলেটি। তার মনে হয় যেন মা তাকে ভালবাসে না। বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে দিন কাটান, যখন ফিরে আসেন ছেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, তিনিও খুশী যে ছেলে লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত, কোন বায়নাক্কা নেই তার।

কয়েকমাস কাটল। একদিন দিলশদ বাবার সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরল মলিন মুখে। গরুর মাথার কাছে গালিচার তাকিয়ার ওপর বসে রইল অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে।

'দিলশদ, কিছু হয়েছে নাকি তোমার?' গরুর নাকের মধ্যে থেকে ভেসে এল নিগিনার গলা।

'হ্যাঁ, কপাল ভেঙেছে আমার', বলল সে। 'আমার পিসী আমার ছেলেবেলায়ই বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে যে আমার সঙ্গে নিজের মেয়ে বেগমের বিয়ে দেবে, মেয়েটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না আমি!' দিলশদ বলল যে একবার খুব ছোট বয়সে একদিন সে ঐ মারকুটে বেগমের সঙ্গে খেলতে চায় নি বলে যে ছুটে এসে তার গায়ে নখ বসিয়ে দিয়েছিল।

দিলশদ তার মেয়েকে বিয়ে করতে নারাজ তা জানতে পেরে বেগমের মা প্রাসাদের দাসদাসীদের উৎকোচ দিয়ে বশ করে শাহজাদার ওপর দিনরাত নজর রাখতে বলল।

দাসদাসীরা তাকে খবর এনে দিল যে দিলশদ শিক্ষকমশাইদের কাছে পড়তে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, সোনার গরুটাকে ছেড়ে নড়ে না এক মুহূর্তও, সবসময় তার মাথার কাছে বসে থাকে।

'আচ্ছা, বোধ হয় ঐ সোনার গরুটার ভিতরে কোন অশুভ শক্তি আছে যেটা বশ করেছে শাহজাদাকে!' বলল বেগমের মা, নিজেই তার ওপর চোখ রাখবে ঠিক করল। প্রাসাদের এমন একটা ঘরে সে ঠাঁই করে নিল যেটার জানলা দিয়ে দেখা যায় দিলশদের ঘরের ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেখান থেকে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগল সে।

সন্ধ্যার আঁধার নামছে। শাহজাদা প্রদীপ জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখল সেখানে বসে সে পড়াশোনা করে, আর নিজের গরুর মাথার কাছে তাকিয়ার ওপর বসে খুশীমনে গল্প করতে লাগল।

'গরুর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অশুভ শক্তি আছে!' এই ভেবে বেগমের মা বাদশাহকে এ খবর দিতে ছুটল।

সিদিন সন্ধ্যাবেলায় বাদশাহ নিজে ছেলের ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগলেন কি করে সে। দিলশদ বসে গরুর মুখের কাছে মুখ বলছে:

'তোমাকে ছেড়ে যাব না আমি কিছুতেই। তোমার বাবার আর নিজের কথা আরও বল শুনি,' গরুর নাসারন্ধ্রে কান চেপে ধরে মন দিয়ে শুনতে লাগল সে।

'আমার বোন ঠিকই বলেছে, গরুর মধ্যে অশুভ শক্তি আছে,' ভেবে বাদশাহ ঘরের দরজা খুলে ঢুকলেন।

'যথেষ্ট বাড়ীতে বসে থেকেছিস, কালই তুই আমার সঙ্গে শিকারে যাবি!' বলে বাদশাহ গরুটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখতে পেলেন না।

'বাবা, আমার শিকারে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না একটুও, আমাকে আমার লেখাপড়া নিয়ে বাড়ীতেই বসে থাকতে অনুমতি দিন,' বলল দিলশদ।

গরুর মধ্যের অশুভ শক্তিটা যে তাঁর ছেলের ওপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তার করেছে তাতে

আর কোন সন্দেহই রইল না বাদশাহ্‌র, তাই ছেলেকে আদেশ দিলেন কোন কথা না বলে শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে।

পরের দিন সকালবেলায় দিলশদ তার বাবার সঙ্গে শিকারে চলে গেল। তাদের সঙ্গে গেল তীর-ধনুক সমেত চল্লিশজন শিকারী, চল্লিশটা বাজপাখী আর চল্লিশটা শিকারী কুকুর।

তারা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায় নি তখনও বাদশাহ্‌র স্ত্রী আর বোন হুড়মুড় করে এসে ঢুকল দিলশদের ঘরে, সোনার গরুটার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের পিছনে পিছনে এল সভার লোকজন যাদের বাদশাহ্‌র আদেশ পড়ে শোনাল বাদশাহ্‌র স্ত্রী:

'অবিলম্বে সোনার গরুটাকে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তার মধ্যে আছে অশুভ শক্তি।'

প্রাসাদের সামনের বিশাল চত্বরটার জড় করা হয়েছে জ্বালানীকাঠের গাদা। সোনার গরুটাকে নিয়ে আসা হল সেখানে, ভোরের সূর্যের আলো পড়ে ঝলকাতে লাগল গরুটা। চারদিক থেকে লোক জড় হল সে দৃশ্য দেখতে। প্রাসাদের দাসরা টেনেটুনি অনেক কষ্টে গরুটাকে তুলল কাঠের গাদার চূড়োর ওপর, ভালো করে সেটাকে দাঁড় করিয়ে কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

অশুভ শক্তির উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে লাগল ভীড়ের লোকেরা আর হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়তে লাগল গরুটার দিকে। আগুনের উঁচু উঁচু শিখ ঢেকে ফেলল গরুটাকে। বাদশাহ্‌র স্ত্রী আর বোন দাসদাসীপরিবৃত হয়ে গরুটাকে ঢেকে ফেলা সেই আগুনের শিখা দেখতে লাগল খুশী মনে।

আগুন নিভে গেলে গলে যাওয়া গরুটা থেকে কেবল একটা ধাতুপিণ্ড পড়ে রইল মাটিতে। লোকে যে যার ঘরে ফিরে গেল। প্রাসাদের সামনেটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল সন্ধ্যার মুখে এক বুড়ী, বোধহয় বাজারে সুতো বেচে খালি ঝুড়ি হাতে নিয়ে ফিরছিল সে, ঠাণ্ডা ছাইয়ের মধ্যে ধাতুপিণ্ডটা পড়ে থাকতে দেখল।

'সুতো জড়াবার জন্য হয়ত কাজে লাগবে,' ধাতুপিণ্ডটা কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল বুড়ী।

শহরের প্রান্তে নিজের ছোট্ট ঘরটিতে বুড়ী সারারাত ধরে সুতো কাটল, কেবল ভোরের দিকে ঘুমে ঢলে পড়ল সে। কিন্তু ভোরের আলোর আভাস দেখা দিতেই বুড়ী উঠে একটুকরো শক্ত রুটি ভেঙে মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে ঝুড়ীতে নতুনকাটা সুতো নিয়ে বাজারে চলল।

রাতের বেলায় ক্লান্ত হয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকে তো সে অবাক, দেখে: উঠোন পরিষ্কার করে ঝাঁট দেওয়া, জল-ছিটান, মিষ্টি ভেজা ভেজা গন্ধ বাতাসে। নিজের ছোট্ট ঘরের দরজা খুলে সে হতভম্ব, চোখ রগড়াতে লাগল: ঘরে সব গোছগাছ করা, জ্বলন্ত চুলার ওপর রান্না করা খাবার। জ্বলন্ত চুলার কাছেই আর একটা পাত্রে চায়েব জন্য জল ফুটছে। ঝুড়িতে তুলোর বদলে রয়েছে কাটা সুতো। দস্তরখানের ওপর রাখা রয়েছে টাটকা তৈরী রুটি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না বুড়ীর, বলল:

'স্বপ্ন দেখছি নাকি?'

কিন্তু নিজের গায়ে চিমটি কেটে বুড়ী বুঝল যে ঘুমোচ্ছে না। প্রথমটায় এসবে বুড়ী যেন একটু খুশীই হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভয় চেপে বসল মনে:

'তিনকুলে কোথাও কেউ নেই তো আমার! কে করল এসব কাজ?'

ভয়ে বুড়ী সারারাত চোখ বুঁজতে পারল না। ভূতপ্রেত দেখতে লাগল সে চারদিকে। মনে হতে লাগল যে ভূতপ্রেতগুলো যেন তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শাসাচ্ছে যে তাকে নিয়ে যাবে নিজেদের সঙ্গে। কোনক্রমে রাতটা কাটাল বুড়ী। ভোরের আলো ফুটলে বুড়ী দেখল যে তার পুরান পোশাকটা কাচা, তাপ্পি দেওয়া সিন্দুকের ওপর রাখা রয়েছে। এমন ভয় ধরল বুড়ীর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সুতোর কুণ্ডিলভরা ঝুড়ি হাতে নিয়ে ভাব দেখাল যেন বাজারে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু সে ঠিক করল চ্যালাকাঠের গাদার আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখবে কি ঘটছে নিজের বাড়ীতে।

একটু পরেই বুড়ী দেখল যে তার ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল আর জলের কলসটা যেন বেরিয়ে এল উড়তে উড়তে। উড়ে উড়ে জলের নালার কাছে গিয়ে ডুব দিল জলে, জলতর্তি হয়ে গিয়ে আবার উড়ে চলল বাড়ীর দিকে। দরজার কাছ পর্যন্ত না গিয়েই কলসটা নিজেই জল ছিটাতে লাগল উঠানে। ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলল বুড়ী তারপর আবার একটুখানি চোখ খুলে দেখে কলসটা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর দেওয়ালের কাছে, এবারে ঝ্যাঁটাটা উঠোনের এদিক থেকে ওদিক পযর্ন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে নিজে নিজেই ঝাঁট দিচ্ছে উঠোনটা। তারপর ঝ্যাঁটাটা দেওয়ালের কাছে এসে পড়ামাত্রই চ্যালাকাঠের গাদা থেকে একবোঝা কাঠ উড়ে উড়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে, একটু পরেই ঘরের ছাদের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল গলগল করে।

কিন্তু তারপরে যখন ঘরের দরজা আবার খুলে গেল আর জলের কলসটা মাটি থেকে উঠে উড়ে গেল নালার দিকে তখন বুড়ীর হাতপা কেঁপে উঠল বুকের মধ্যে হাতুড়ী পিটতে লাগল, প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে চোখ মেলে বুড়ী দেখে শুয়ে আছে নিজের বিছানায়, আবার জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল তার: তার মুখের ওপর হাওয়ায় দুলছে একটা পেয়ালা আর কোথা থেকে জলের ছিটা এসে লাগছে তার মুখে।

'কে তুমি শয়তান না মানুষ?' আতঙ্কিত বুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

'বুড়ীমা, ভয় পেও না, আমি মানুষই, নাম নিগিনা,' মেয়ের গলায় শোনা গেল। 'সাদা কোন কিছু দাও আমায়, গায়ে চাপা দেব আমি, তাহলেই তুমি আমায় দেখতে পাবে।'

বুড়ী তাড়াতাড়ি পোশাক হাতড়ে চাবির গোছা খুঁজতে লাগল, খুঁজে পেয়ে এগিয়ে ধরে বলল:

'আমার সিন্দুকে রাখা আছে সাদা কাপড় আমি মরলে পরে কাজে লাগবে বলে। যদি তুই সত্যি কথা বলিস তো উঠা নিয়ে চাপা দে গায়ে।'

সিন্দুক থেকে বার করে নেওয়া সাদা কাপড়টা যেই নিগিনার মাথায় কাঁধে চাপা পড়ল অমনি বুড়ী দেখতে পেল তার চেহারাটা।

'ওঃ, কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলি আমায়, এবার বল দেখি কে তুই কি করে এলি আমার কাছে?'

নিগিনা বলল তার বাবার কথা, বলল যে তিনি গেছেন দূরে দেশে অদৃশ্য বস্তু কে দৃশ্য করার ওষুধ তৈরী করার জন্য গাছগাছড়া খুঁজতে বলল নিজের দাদুর কথা যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। কিন্তু সোনার গরুর কথা, কেমন করে সেটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, কেমন করে অদৃশ্য হয়ে যাবার ওষুধ খেয়ে সে কাঠের গাদার কাছে পেঁৗছে বেরিয়ে পড়ে গরুটা থেকে অদৃশ্য অবস্থায়, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে গরুটার জন্য সেসব কথা কিছুই বলল না। বলল না সে কথাও যে সে ঠিক করেছিল যে ঐ গরুর অবশিষ্ট ধাতুপিন্ডটা তুলে নেবে যে তারই সেবা করবে।

প্রাসাদে দিলশদের ঘরে সোনার গরুর চোখের ভিতর দিয়ে নিগিনা দেখেছিল দিলশদের মা আর পিসীকে, তাদের দেখে তার মনে হয়েছিল ভয়ংকর আর নির্দয়, তাই সে ভাবল প্রাসাদে আর ফিরে যাবে না।

নিগিনার কাহিনী শুনে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল বুড়ীর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল বুড়ী:

'বেচারী, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোর ক্ষতি করতে পারবে না কেউ, আমরা একসঙ্গে থাকব।'

কয়েকদিন কাটল। নিগিনা বুড়ীর কাজকর্মে সাহায্য করে সুতোও কাটে। পরিশ্রমী নিগিনা বুড়ীর কাছে বোঝা তো মনে হয় না মোটেই, বরং আরও ভাল থাকতে লাগল সে।

বাজার থেকে ফিরে বুড়ী তাকে বলে যে সব খবর শুনেছে সে বাজারে। একদিন বুড়ী ফিরে বলে:

'লোকে বলাবলি করছে যে অমাদের শাহজাদার নাকি একটা খেলনা ছিল সোনার গরু। এত ভালবাসত সে খেলনাটাকে যে সারাদিন নাকি সেটাকে নিয়েই বসে থাকত। জানা যায় যে ঐ গরুটার মধ্যে নাকি ছিল অশুভ শক্তি, যে শাহজাদাকে নিজের কাছে টানতে থাকে। তাই বাদশাহ ছেলেকে শিকারে নিয়ে গেলেন আর আদেশ দিয়ে গেলেন ঐ সময়ের মধ্যে গরুটাকে জ্বালিয়ে দিতে। শিকার থেকে ফিরে শাহজাদা যখন সে কথা জানতে পারল তখন এমন ভেঙে পড়ল যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে রয়েছে সেই থেকে, কাউকে ঢুকতে দেয় না নিজের ঘরে আর মুখেও দেয় না কিছু। নকীব শহরময় ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে 'যে শাহজাদাকে খাওয়াতে পারবে তাকে বাদশাহ তার ওজনের সমান পরিমাণ সোনা দেবেন। সাধারণ লোকেদের মধ্যে থেকে আর কে খাওয়াতে পারে শাহজাদাকে?' বলে শেষ করল বুড়ী তার কাহিনী।

'বুড়ীমা তুমি ওকে খাওয়াতে পার!' বলল নিগিনা।

'কি সে বলিস! কি করে তা পারব আমি!'

'তোমাকে তা করতেই হব, বুড়ীমা, নাহলে শাহজাদা সে অনাহারে মরবে!'

নিগিনার অনুরোধে বুড়ী বাজারে গিয়ে একটুকরো মাংস নিল: তা দিয়ে নিগিনা তৈরী

করল মাংসর পিঠে। বুড়ীর অলক্ষ্যে একটা পিঠের মধ্যে ভরে দিল সে নিজের আংটিটা যেটা তার বাবা তৈরী করে দিয়েছিলেন তাকে। দিলশদ খুব ভালো করেই জানে আংটিটার কথা — প্রায়ই সেই আংটিটির সূক্ষ্ম কারুকাজের প্রশংসা করত সে। পিঠেভরা থালাটা একটা কাপড়ে মুড়ে দিয়ে নিগিনা বলল:

'প্রাসাদে গিয়ে বল যে শাহজাদার জন্য খাবার এনেছ। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা কর যে তোমার হাত থেকে খাবেই শাহজাদা। আর শাহজাদার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলবে তাকে 'আমি নিগিনার কাছ থেকে খাবার এনেছি।' যদি সে প্রমাণ চায় তো বলবে 'পিঠে খাও, পিঠের ভিতরেই সে প্রমাণ পাবে!'

মেয়েটির কথামতই কাজ করল বুড়ী।

নিগিনার নাম শুনেই দিলশদ তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। তাড়াতাড়ি করে খেতে আরম্ভ করল তার আনা খাবার। একটা পিঠে তুলে মুখে দিতেই শক্ত কি একটা ঠেকল দাঁতে। সেটা বার করে দেখে নিগিনার আংটি বলে সে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গেই।

'তার মানে, বেঁচে আছে নিগিনা! কোথায় সে এখন?' বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল সে।

যদি তাকে দেখতে চাও তো বড় রাস্তায় গিয়ে চলে যাবে একেবারে শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে যাবে নদীর দিকে সেখানে আমি তোমাকে নিতে আসব।'

বাদশাহ খুব খুশী হলেন যে বুড়ী ছেলেকে খাওয়াতে পেয়েছে, তাকে খাবারদাবার কেনার জন্য কিছু পয়সা দিতে আদেশ দিলেন।

পরের দিন শহরের প্রান্তে নদীর কাছে দিলশদ দেখা করল বুড়ীর সঙ্গে, বুড়ী তাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়ী। যদিও তার বাড়ীটা জীর্ণ, দীনহীন তবুই দিলশদের চোখে পড়ল বাড়ীটির অপূর্ব পরিচ্ছন্নতা। অতিথিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাল, তারপর নিজে গেল পোলাও রান্নার যোগাড়যন্তর করতে।

দীন কুটীরটি ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল দিলশদ, দেখল মাটিতে পাতা ছেঁড়া শতরঞ্চি, পাতলা হয়ে গেছে কম্বলটা আর ঘরের কোনে একটা পুরোন সিন্দুক। এখানের কোন কিছুতেই নিগিনার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। 'প্রতারিত হয়েছি আমি' এই ভেবে যেই উঠতে যাবে সে চলে যাবার জন্য, এমন সময় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে এই দেখে যে কেমন করে তার সামনে আপনা হতেই বিছিয়ে গেল রুটিসমেত দস্তরখান, দেয়ালের অন্য একটা তাক থেকে চলে এল ফলভরা থালা, চায়ের পাত্র, পেয়ালা। চুলার ওপর থেকে ফুটন্তজলের পাত্রটা আপনা হতেই এসে জল ঢেলে দিল চায়ের পাত্রের মধ্যে। রুটিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে রাখা হয়ে গেল দিলশদের সামনে। এসব দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল দিলশদ, ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে উদ্যত হল সে...

'দিলশদ! আমি যে এখানেই আছি তা কি বুঝতে পারছ না তুমি?' পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে থেমে পড়ল সে।

'নিগিনা! তুমি এখানে, তোমায় আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'এখানে দেখতে পাবে', বলল নিগিনা, দেয়ালের পেরেকে ঝুলতে থাকা সাদা চাদরটা উড়ে এসে ঢেকে ফেলল মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তখনই সে চিনতে পারল নিগিনাকে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল তারা, যে সব ঘটনা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তা জানাল পরস্পরকে। বাবার সঙ্গে শিকারে যেতে রাজী হয়েছিল বলে নিজের ওপর রাগ হল দিলশদের আর বাবার ওপরও রাগ হল এমনি প্রতারণা করার জন্য।

নিগিনা যখন বলতে লাগল যে সোনার গরুটা লোকেরা জ্বালিয়ে দেয় তার ভেতরে অশুভ শক্তি আছে ভেবে আর তখন বাঁচবার জন্য নিগিনাকে খেতে হয় অদৃশ্য হয়ে যাবার ওষুধটা, সে সব কথা শুনে দিলশদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'আমি প্রাসাদে ফিরে যেতে চাই না। নিগিনা, তোমার ঐ ওষুধটা আমাকেও দাও!' অনুনয় বিনয় করতে লাগল দিলশদ।

'কিছুতেই না! কখনই তোমায় দেব না ঐ ওষুধটা। আমি চাই না যে তোমারও এমনি দশা হোক আমার মত।' বলল নিগিনা।

'কিন্তু তোমাকে আর ছেড়ে যেতে চাই না আমি।' বলল দিলশদ।

'আমার বাবার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একমাত্র বাবাই বলতে পারে আমাদের কি করা উচিত।' বিষণ্নস্বর নিগিনা।

কয়েকদিন সবার চোখে ধুলো দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে নিগিনার সঙ্গে দেখা করতে পারল দিলশদ। কিন্তু তারপরে তাকে অনুসরণ করতে থাকা বেগমের মায়ের দাসেরা বেগমের মাকে জানাল সে কথা।

যখন বাদশাহ জানলেন যে বুড়ী দিলশদকে খাওয়াতে পেয়েছিল সেই বুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে যায় সে তখন তিনি আদেশ দিলেন:

'ঘরে বন্ধ করে রাখ ওকে, বাইরে বেরোতে দিও না।'

বাদশাহের আদেশে অবিলম্বে বিবাহ উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। বেগমের মা স্বপ্নে-জাগরণে নিজের মেয়েকে দেখছে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর স্ত্রী হিসেবে। ঘরে বন্ধ দিলশদ নিগিনার কাছে যেতে পারছে না আর কাউকে তার কাছে পাঠাতেও পারছে না তার ওপর নতুন বিপদ ডেকে আনার ভয়ে।

নিগিনা তার অপেক্ষায় রইল একদিন, দুদিন, তারপর তৃতীয়দিনে নিজেই চলল প্রাসাদের দিকে। অদৃশ্য বলে সে সহজেই ঢুকে গেল খোলা ফটকের মধ্য দিয়ে।

প্রাসাদের চত্বরেই নিগিনা দেখল খুব ব্যস্ততা। ছাড়াছাড়া কথাবার্তা শুনে সে বুঝল একটু পরেই পারিষদ-সভাসদবর্গ আসবে বাদশাহের কাছে তাদের সামনে বাদশাহ ঘোষণা করবেন দিলশদের সঙ্গে বেগমের বিবাহের কথা।

বিশাল সভাকক্ষে গালিচাবিছান নীচু নীচু তক্তাগুলোর ওপর বসে আছে সভাসদরা আর সবার চেয়ে উঁচুতে জরির ওয়াড়পড়ান গদীর ওপর বসে আছেন বাদশাহ। দিলশদ সভায় প্রবেশ করামাত্রই বাদশাহ জোরে জোরে ঘোষণা করলেন:

'আমি আমার ছেলের বিবাহ দেব আমার ভগিনীকন্যা বেগমের সঙ্গে। কাল হবে বিয়ের প্রথম দিনের উৎসব।'

'না, বেগমকে বিয়ে করতে চাই না আমি।' চীৎকার করে বলে দিলশদ চলে যাবার জন্য এগোল।

'ধর ওকে!' আদেশ দিলেন বাদশাহ অবাধ্যতার জন্য কারাগারে বন্ধ করা হবে তোকে।'

এমন সময় দৌবারিক এসে খবর দিল যে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা যে শাহজাদাকে সোনার গরুটা বেচেছিল, প্রাসাদে ঢুকতে চাচ্ছে সে।

অদৃশ্য নিগিনা দাঁড়িয়ে ছিল বাদশাহ আর দিলশদের মাঝে, এ খবর সেও শুনল।

'বাবা ফিরে এসেছে!' আপনা হতেই বেরিয়ে এল এ চীৎকার তার মুখ দিয়ে।

সবাই ফিরে তাকাল সে স্বরের দিকে কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কেবল দিলশদ বুঝল যে নিগিনা সেখানে, প্রাসাদেই আছে।

'কিমিওগারকে ভিতরে আসতে দাও।' বলল দিলশদ। 'তা নাহলে আমি সবার চোখের সামনেই আত্মহত্যা করব।'

কিমিওগারকে প্রাসাদে ঢুকত দেবার আদেশ দিতেই হল বাদশাহকে বাধ্য হয়ে। কিমিওগার সভায় ঢুকেই বাদশাহকে বলল:

'সোনার গরুটাকে একবার দেখার অনুমতি দিন, জাঁহাপনা!'

'যে সোনার গরুটা তুই বেচেছিলি আমাদের, ওর ভেতরে ছিল অশুভ শক্তি, তাই ওটাকে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছি আমি!' হিংস্র আনন্দে বললেন বাদশাহ।

'হায়, কি করলেন! নিজের মেয়েকে মেরে ফেললেন!' কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে উঠল কিমিওগার।

'আমার কোন মেয়ে ছিল না! মিথ্যা বলছিস তুই!..'

'না, সোনার গরুর ভিতরে ছিল আপনার মেয়ে! কি করে ওকে মারলেন আপনি!' বলল কিমিওগার।

'আমি বেঁচে আছি! এই যে এখানে আমি!' চীৎকার করে উঠল নিগিনা।

'আয় এদিকে, এই ওষুধটা খেয়ে নে!' বলল খুশী হয়ে কিমিওগার।

তার হাত থেকে ছোট্ট শিশিটা নিয়ে নিগিনা খেয়ে নিল তার ভিতরের বস্তুটা, সেই মুহূর্তে সবাই দেখল মেয়েটিকে, রোগা, ম্লান চেহারা, বড় বড় উজ্জ্বলচোখ।

'ও জাদু জানে! ধর ওকে! পুড়িয়ে মারা দরকার ওকে!' ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন বাদশাহ।

'দাঁড়ান, আমার কথাটা শুনুন, পুড়িয়ে মারার সময় অনেক পাবেন,' বলল কিমিওগার বাদশাহের পত্নীর গোপন করা কথাটা বলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে বলল ষোলবছর আগে বাদশাহের পত্নীর নাম করে এক বুড়ী এসে তার সদ্যজাত পুত্রসন্তানকে নিয়ে নেয় আর তার বদলে রেখে যায় বাদশাহের কন্যাকে সেই কথা।

'বাবা! আপনি আমার বাবা!' আনন্দে চীৎকার করে দিলশদ কিমিওগারের দিকে ছুটে গেল।

'এ মিথ্যা! জাদুকর, আমার ছেলেকে নিয়ে নিতে চায়! মেয়ে চাই না আমার! ওকে ধরে কারাগারে বন্দী কর!' ভয়ে, রাগে কাঁপতে আর চীৎকার করতে লাগল বাদশাহ।

সভার মধ্যে আতঙ্ক হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভয়ে জ্ঞান হারাল বাদশাহ্‌র পত্নী। কিছু লোকজন তার দিকে ছুটে গেল, আর কেউ কেউ আবার ডাইনের ভয়ে বাড়ীর দিকে দৌড় দিল।

সময় নষ্ট করল না কিমিওগার। যতক্ষণে বাদশাহ মেয়ের কথা অস্বীকার করছিলেন আর আদেশ দিচ্ছিলেন ততক্ষণে সে নিজে অদৃশ্য হবার ওষুধ খেয়ে নিয়েছে, খাইয়েছে নিজের ছেলেমেয়েদেরও। যখন প্রহরীরা কিমিওগারকে ধরতে ছুটে এল তাকে আর দেখা গেল না সভার মধ্যে। তখন সে ছেলে দিলশদ আর নিগিনাকে নিয়ে প্রাসাদের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। অদৃশ্য হয়ে তারা সেই শহর ছেড়ে চলে গেল আর কখনও সেখানে ফিরে আসে নি তারা।

অন্য শহরে পৌঁছে তারা খেয়ে নিল কিমিওগারের নতুন ওষুধটা, আবার দৃশ্য হয়ে গেল তারা।

এমনি করে বাদশাহ সন্তানহারা হলেন আর কিমিওগার তার ছেলে ফিরে পেয়ে নিজের পালিতকন্যা নিগিনার সঙ্গে তার বিয়ে দিল।

সারা যীবন তারা কাটাল মিলেমিশে, সুখেস্বচ্ছন্দে।

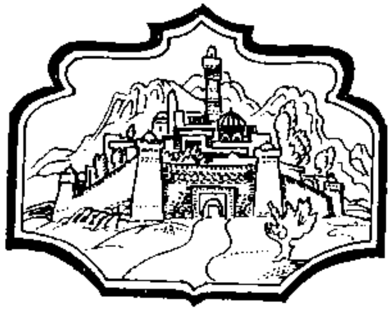

নিষ্ঠুর বাই ও বুদ্ধিমান নেড়ামুণ্ডু

এক ছিল মেয়েমানুষ। অল্পবয়সে বিধবা হল সে ছোট ছোট তিনটি ছেলে নিয়ে। মেয়েমানুষটি অতি কষ্টে বড় করে তুলতে থাকে তাদের, সুতো কেটে, সেলাই করে। ছেলেরা যখন বড় হল তখন তার মাথার শেষ চুলটিও সাদা হয়ে গেছে।

একদিন বুড়ী মা ছেলেদের ডেকে বলল:

'তোমরা বড় হয়েছ, আমার বয়স হয়েছে, আঙুলগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে আর সুতো কাটতে পারে না মোটে, ছুঁচের গর্তটা আর চোখে দেখতে পাই নে। এবার তোমরা নিজেরাই রোজগারের চেষ্টা কর।

'মা গো, দেখ আমার কেমন মজবুত চেহারা, হাতে কত বল, খেতিমজুরের কাজ করে যা পাব সব এনে দেব তোমায়,' বলল বড় ছেলে।

বুড়ী রুটি তৈরী করে রুমালে মুড়ে ছেলের সঙ্গে দিয়ে রওনা করিয়ে দিল তাকে।

ছেলেটি শহরে এসে বাইয়ের* বাড়ীতে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। বাই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল:

'কি চাই তোর ?'

'আমি খেতিমজুর।' বলল ছেলেটি।

'জমি চাষ করতে পারবি ?' জিজ্ঞাসা করল বাই।

'পারব।' বলল ছেলেটি।

বাই তাকে বাড়ীর ভিতরে এনে বলল:

---

* বাই — ধনী লোক।

'তোকে কাজে নেব, কিন্তু একটি শর্তে, যদি রাজী হোস তো ভাল মাইনে পাবি আর রাজী না হলে এখনি পথ দেখ।'

'তোমার শর্তটা বল শুনি ?'

বাই বলল: 'তোকে আমি যাই করতে বলি না কেন সবকিছু করবি, রাগ করবি না। যদি রাগ করিস তো আমি তোর নাককান কেটে দেব। আর যদি আমি তোর ওপর রাগ করি তো তুই আমার নাককান কেটে দিবি।'

ভেবেচিন্তে রাজী হল ছেলেটি। ঘুমোতে শুল সে। ভোরবেলায় বাই তার ঘুম ভাঙিয়ে হাতে একটা রুটি ধরিয়ে দিয়ে বলল:

'কাজে লাগ্ গিয়ে।'

ছেলেটি গাধার পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে, মহিষের কাঁধে যোয়াল-লাঙল জুড়ে চলল মাঠে। বাই তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ফটক পর্যন্ত গিয়ে বলল:

'এই সমস্ত গমবীজ আজ পুঁতে দিবি আর ফেরার পথে কাঠ কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে আনবি।'

'ঠিক আছে,' বলে রওনা দিল ছেলেটি।

শক্তপোক্ত চেহারা তার, পরিশ্রমী, তাই সারাদিনে জমির বেশ বড় একটা অংশ চাষ করল সে, পুঁতল গমবীজ, তারপরে পাহাড়ে উঠে একটা গোটা গাছ কেটে তাকে চ্যালা করে চাপাল গাধার পিঠে।

যখন সে বাড়ী ফিরল বাই তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল:

'কি রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস নাকি ? রাগ হয় নি তো কোন কারণে ?'

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খেতিমজুর, কিন্তু শর্তের কথা মনে পড়ে বলল:

'না ক্লান্তও হই নি আর রাগও হয় নি কোন কারণে।'

পরের দিন বাই আবার তাকে ভোরবেলায় জাগিয়ে একই সব কাজ করতে আদেশ দিল। ছেলেটি আবার সব কাজ করে বাড়ী ফিরল বেশ দেরী করে। এমনি চলল কয়েকদিন ধরে, প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ছেলেটি। তাই একদিন সমস্ত জমি চাষ করতে পারল না সে আর কাঠ কাটতেও পারল না। ঘরে ফিরল সে মনমরা হয়ে। কাঠছাড়াই ঘরে ফিরেছে দেখে বাই জিজ্ঞাসা করল:

'কাঠ আনিস নি কেন ?'

'আঁধার নামল, কাঠ কেটে উঠতে পারি নি।'

বাই বলল:

'রাগ হচ্ছে তোর ?'

আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি:

'নিশ্চয়ই। আর কত পারা যায় অত্যাচার সইতে ? তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।'

তখনি বাই তার নাককান কেটে নিয়ে তাড়িয়ে দিল তাকে।

ছেলে ঘরে ফিরলে তাকে দেখে কেঁদে ফেলল তার বুড়ী মা: 'বাছা রে, এ তোর কি হল ?'

ছেলেটি বলল সব ঘটনা। তা শুনে বুড়ীর মেজ ছেলে রেগে গেল, বলল: 'তুই কুঁড়ের বাদশা ! তাই তোর এমনি দশা। আমিও যাব ঐ বাইয়ের কাছে, ওর শর্তমত কাজ করব, ভাল মাইনা পাব।'

তখনি বাইয়ের কাছে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সে।

'কি চাই তোর ?' জিজ্ঞাসা করল বাই।

'আমি এসেছি আমার ভাইয়ের বদলে কাজ করব বলে।

বাই তার শর্তের কথা বলল, রাজী হল ছেলেটি। সেও প্রতিদিন গাধার পিঠে গমের বোঝা চাপায়, মহিষের কাঁধে যোয়াল-লাঙল জোতে, মাঠে যায়, সারাদিন জমি চাষ করে বীজ পোঁতে, সন্ধ্যাবেলায় কাঠের বোঝ গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘরে ফেরে। এই প্রচণ্ড অমানুষিক পরিশ্রমে সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে কাঠ কাটতে পারল না। বাই তাকে কাঠছাড়া ফিরতে দেখে বলল:

'কাঠ আনিস নি কেন ?'

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই কাটতে পারি নি।' বলল ছেলেটি।

বাই বলল: 'রেগে গেছিস নাকি ?'

এ ছেলেটিরও ধৈর্য ভাঙল:

'নিশ্চয়ই !' অত পরিশ্রম কেউ সহ্য করতে পারে নাকি ?'

তারও নাককান কেটে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল বাই।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল ছেলেটি। বুড়ী মা হাহুতাশ আরম্ভ করে দিল।

'হা পোড়া কপাল ! তোর ঘরে আগুন লাগুক বাই। সুখের মুখ দেখবি না তুই কখনো !'

সবার ছোট ভাই ন্যাড়ামাথা ছেলেটি সবকিছু শুনেটুনে বলল 'দাদারা, তোমরা অকর্মা আর কুঁড়ে, দেখো আমি বাইয়ের শর্ত পূরণ করব।'

মা ছেলেকে বোঝাতে লাগল: 'যাস না বাছা, তোরও একই দশা হবে। তখন তোদের নিয়ে কি করব আমি ?' কিন্তু সেসব কথায় কান না দিয়ে সে শহরে চলে গেল। বাইয়ের বাড়ীর কাছে গিয়ে দরজার ধাক্কা দিল সে বাই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল:

'কি চাই রে, নেড়ু ?'

'আমার ভাইয়েরা তোমার শর্ত পূরণ করতে পারে নি। আমি এসেছি ওদের জায়গায় কাজ করতে।

রাজী হয়ে বাই তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। ভোরবেলায় তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে চাষের কাজে পাঠাল। নেড়ামাথা জমিতে গিয়ে গমবীজগুলো একটা গর্তে ফেলে দিয়ে ছায়ায়

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যাবেলায় সে বাইয়ের যোয়াল-লাঙল টুকরো টুকরো করে কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে ফিরে গেল মনিবের কাছে।

'এই যে কাঠ!' বলল বাইকে।

'ওরে নেড়ু, এমন শুকনো কাঠ কোথায় পেলি তুই?' জিজ্ঞাসা করল বাই।

'লাঙল-যোয়াল কেটেছি।'

রাগে অন্ধ হয়ে গেল বাই, কিন্তু ভাব দেখাল যেন রাগছে না।

'কেন তুই এমন করলি?'

'বোধহয় মনিবের রাগ হচ্ছে?' জিজ্ঞাসা করল নেড়ামাথা খেতিমজুর।

অতি কষ্টে রাগ চেপে বাই বলল:

'না, রাগ হচ্ছে না।'

'তাহলে' বলল খেতিমজুর, 'কালকের জন্য নতুন লাঙল-যোয়াল যোগাড় কর।'

পরের দিন নেড়ামাথা আবারও ভোরবেলায় মাঠে গিয়ে একটা গর্তে ঢেলে দিল গমবীজ, বেশ আরাম করে ঘুমাল, তারপর সন্ধ্যাবেলায় লাঙল আর যোয়াল কেটে ঘরে ফিরল। বাই এবারও ভাব দেখাল যেন রাগ হয় নি। এমনি চলল একমাস ধরে। শর্ত ভাঙার ভয়ে বাই কিছু বলেও না। তখন নেড়ামাথা একটা মহিষকে কেটে গমবীজের খালি বস্তায় মাংসটা ভরে, বরাবরের মত লাঙল-যোয়াল কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে মনিবের ঘরে ফিরল।

'এই নেড়ামুণ্ডু, আর একটা মহিষ কোথায়?'

'সেটাকে কেটেছি আমি, বস্তায় আছে ওটার মাংস। তোমার রাগ হচ্ছে নাকি?'

রাগ করছে না বলা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না বাইয়ের। নেড়ামাথা প্রতিদিন তার বীজ ফেলে দেয়, লাঙল-যোয়াল কাটে, একটা করে মহিষ কাটে। শেষে বাই তার স্ত্রীকে বলে:

'ঐ নেড়ামুণ্ডু আমাদের ফতুর করে দেবে। ভয় হচ্ছে আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারব না আর ও আমার নাককান কেটে দেবে। পালাতে হবে, নাহলে ওর হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই।'

স্ত্রী একমত হল স্বামীর সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় তারা নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল, দামী দামী জিনিসপত্র সব সিন্দুকে ভরল, তারপর ঘুমোতে শুল। কিন্তু চালাক খেতিমজুর তাদের মতলব ধরে ফেলল। বাই আর তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে সে সিন্দুক থেকে দামী দামী জিনিসপত্র বার করে নিয়ে নিজে তার মধ্যে লুকিয়ে রইল। মাঝরাতে বাই আর তার স্ত্রী উঠে পোঁটলা-পুঁটলি আর সিন্দুকটা নিয়ে পথে বেরোল। যেতে যেতে ভোর হল, দুপুর গড়াল। ক্লান্ত হয়ে তারা একটা নদীর ধারে থামল বিশ্রাম নিতে। বাই স্ত্রীকে বলল 'চা তৈরী কর।'

'নেড়ামাথা থাকলে কাঠ এনে দেতে পারত' বলল স্ত্রী।

সেকথা শুনে নেড়ামাথা সিন্দুকের ভিতর থেকে চীৎকার করে বলল: 'আমি এখানেই, আপনাদের সেবা করতে প্রস্তুত।'

রেগে গেল বাই:

'ওরে শয়তান! তুই আমার সব বীজ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিস, সব মহিষ কেটেছিস, সব লাঙল কেটেছিস। আর এখন আমাদের দামী দামী জিনিসগুলো চুরি করে আবার আমাদের পিছু নিয়েছিস।'

'হুজুর, আমি দেখছি তোমার রাগ হচ্ছে।' বলল নেড়ামাথা।

কিন্তু বাই আর সামলাতে পারল না নিজেকে, চীৎকার করে উঠল:

'এত সবের পরেও রাগ হয় না কার?'

এই তো তুমি শর্ত পূরণ করলে,' বলে নেড়ামাথা সঙ্গে সঙ্গে ছুরি বার করে বাইয়ের নাককান কেটে নিল। তারপর বাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে সেখানে তার লুকিয়ে রাখা দামী দামী জিনিসপত্র ও বাইয়ের অন্যান্য ধনসম্পত্তি নিয়ে নিজের ঘরে ফিরল। এমনি করে সে ভাইয়েদের ওপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিল।

এক চালাক মেয়েমানুষদের কীর্তিকলাপ

কোন এক সময় একজন লোক ছিল। তার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী আর সাজগোজ করতে খুব ভালবাসত সে। তারপর অভাবে পড়ল তারা, পয়সাকড়ি নেই হাত মোটেই। একদিন স্ত্রী তার স্বামীকে বলল:

'বাজারে গিয়ে কিছু নিয়ে আসি খাবার জন্য।'

একটা সুন্দর পোশাক পরল সে, কানে দুল ঝোলাল, সুর্মা টানল ভ্রূতে, গালে একটা তিল আঁকল, তারপর বাজারে চলল কোমর নাচাতে নাচাতে হাসতে হাসতে। দেখে, মাংসওয়ালা একটা ভেড়া কেটে ছাল ছাড়াচ্ছে। মেয়েমানুষটি তার দিকে একটা রূপার মোহর এগিয়ে দিয়ে বলল:

'এই মোহরের বদলে মাংস দাও আমায়।'

'আরে মেয়ে ও মোহরের কোন দামই নেই।' বলল মাংসওয়ালা।

'মোহরটার হয়ত দাম নেই, কিন্তু আমার তো দাম আছে।'

তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে মাংসওয়ালা সত্যিই খুব সুন্দরী সে। বলে:

'তোর স্বামী আছে নাকি? তোর ঘরে আসতে দিবি?'

'যদি আমাকে তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তো এসো। কিন্তু তার আগে আমাকে দাও আধমন চাল, আধমন ঘি আর রেশমী পোশাক। আমি ঐ যে বড় বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে থাকি। রাতের বেলায় এসো।'

মাংসওয়ালা তাকে দিল সবকিছু যা যা সে চাইল আর বলল: 'রাতের বেলায় আমার অপেক্ষায় থাকিস।'

সেসব জিনিস বাড়ীতে নিয়ে রেখে এসে সে গেল শহরের কাজীর কাছে। তাকে মোহরটা দিয়ে বলল:

'ভাঙিয়ে দাও এটাকে।'

'এটার কোন দাম নেই,' বলল কাজী।

'হয়ত মোহরটার কোন দাম নেই, কিন্তু আমার তো দাম আছে' বলল মেয়েমানুষটি।

সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে কাজীর মাথা ঘুরে গেল।

'আমাকে আসতে দিবি তোর কাছে?' জিজ্ঞাসা করল সে।

'আমাকে তোমার মনে ধরলে আসবে নাই বা কেন? কিন্তু আমার জন্য ভাল পণ দিতে হবে: আধমন চাল, আধমন ঘি আর রেশমী পোশাক-আশাক।'

কাজী দিল পণ। সেসব বাড়ীতে রেখে এসে আবার বাজারে গেল মেয়েমানুষটি। দেখে বাজারের তদারককারী বসে আছে আরাম কেদারায়, মাথায় বিরাট পাগড়ী। তাকে পয়সাটা দিয়ে বলল:

'এটাকে ভাঙিয়ে দাও।'

'তোর মোহরের কোন দামই নেই।'

'হুজুর, মোহরটার দাম নেই তো আমার দাম ও কি কমে গেল নাকি?'

তার দিকে তাকিয়ে বাজারের তদারককারীর মনের শান্তি ঘুচল।

'তোর ঘরে আসতে দিবি?' বলল সে।

'এসো, কিন্তু পণ দিতে হবে তোমায় আধমন চাল, আধমন ঘি আর রেশমী পোশাক-আশাক। আর ঐখানে আমার বাড়ী।'

সবকিছু দিল তার কথামত, বাড়ী চলে গেল মেয়েমানুষটি। তার স্বামী দেখল যে এত খাবার জিনিস এনেছে, খুশী হল খুব। স্বামীকে বলল মেয়েমানুষটি:

'এখন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। রাতের বেলায় আমার কাছে একজন লাক আসবে। যেই সে বাড়ীতে ঢুকবে অমনি তুমিও ঢুকবে তার পিছন পিছন।'

মাঝরাতে এল মাংসওয়ালা। সাজগোজ করে মেয়েমানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'তোমার আলিঙ্গন করতে সাধ হচ্ছে, সুন্দরী।' বলল মাংসওয়ালা।

মেয়েমানুষটি বলল: 'দাঁড়াও, আগে খেয়ে দেয়ে নেওয়া যাক, এসো, তারপরে আলিঙ্গন করবে।'

এমন সময় তার স্বামী বাড়ীতে ঢুকে ধমাস করে দরজা বন্ধ করল।

'ও কে?' ভয় পেয়ে গিয়ে বলল মাংসওয়ালা।

'ও আমার স্বামী। কয়েকমাস ছিল না এখানে, হঠাৎ এসে পড়েছে।'

'কি করব আমি এখন?'

'ভয় পেও না, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখব। স্বামীর চলে যাবার সময় আমাদের গরুর বাছুর হবার কথা ছিল। আমি তোমাকে দরজার বাইরে বেঁধে তারপর দরজা বন্ধ করে দেব। যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করে তো বলব ওখানে বাছুরটা আছে।'

স্বামী ভিতরে এসে বসল:

'ওগো ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।'

'হা কপাল! কোথা থেকে আমি পাব খাবারদাবার? তুমি তো একেবারে খোঁজই রাখ না বাড়ীর কথা।'

স্বামী বলে: 'জাহাজে মাল বোঝাই করলাম। কিন্তু জাহাজের দানো ডুবিয়ে দিল জাহাজটাকে, সব মাল ডুবে গেল, আমি কোনরকমে প্রাণে বেঁচেছি। আমাদের গরুটা কোথায়?'

'পোড়া কপাল! গরুটা তো নেই। ওখানে দরজার বাইরে বাছুরটা আছে।'

'ছুরি নিয়ে এস, ওটাকেই কাটব।'

এই বলে স্বামী কুড়ুল তুলে নিয়ে 'বাছুরটার' কাছে গেল। সেটার পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরখ করল সেটা রোগা না মোটা। চুপ করে রইল মাংসওয়ালা। তখন মেয়েটির স্বামী তার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল মুগুর দিয়ে। হাউমাউ করতে করতে মাংসওয়ালা দৌড় লাগাল গলায় বাঁধা দড়িটা নিয়েই। স্বামীস্ত্রী এরপর হাসল অনেকক্ষণ ধরে। এবার মেয়েমানুষটি স্বামীকে বলল: 'এবার আসবে দ্বিতীয় অতিথি।'

একটু পরেই কাজী এল। মেয়েমানুষটি দামী কম্বল পাতল, চুল আঁচড়ে, সাজগোজ ঠিকঠাক করে নিল।

'এসো তোমায় একটু আদর করি', সময় নষ্ট করতে চাইল না কাজী।

'ভালবাসার জন বেঁচে থাকলে আদর ভালবাসার সময় পালাবে না,' বাধা দিল তাকে মেয়েমানুষটি। 'এসো আগে খেয়ে নেওয়া যাক।'

কিন্তু এমন সময় স্বামী বাড়ীতে ঢুকে দরজায় আওয়াজ করল।

'ও কে?'

'ও আমার স্বামী। কয়েক বছর আগেও উধাও হয়ে যায়।'

'কোথায় লুকোব আমি?'

'যখন স্বামী আমায় ফেলে চলে যায় আমি পোয়াতী ছিলাম। আমি তোমাকে দোলনায় বেঁধে শুইয়ে রাখব, বলব তার অনুপস্থিতিতে ছেলে হয়েছে আমার। ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন পালাবে তুমি।' বলে তাকে শুইয়ে বেঁধে দিল দোলনায়। সে শুয়ে রইল তার লম্বা দাড়ি নিয়ে আর দোলনা থেকে বেরিয়ে রইল তার পাগুলো। স্বামী ঘরে ঢুকে গদীতে বসে বলল: 'বাই গো, খেতে দাও, বড় খিদে পেয়েছে।'

'কোথায় পাব খাবার? আমার ও কিছু কম খিদে পায় নি।'

রেগে গেল স্বামী:

'কোথায় আমাদের গরুবাছুর? আমার সব ধনসম্পত্তি কোথায় গেল?'

'মালিক ছিল না তাই সব খুইয়েছি আমরা।'

'আর আমার পোশাক-আশাক?'

'কিছু নেই। কিন্তু আমি এক ছেলের জন্ম দিয়েছি, একেবারে ঠিক তোমার মতন, ঐ যে দোলনায় শুয়ে।'

খুশী হয়ে স্বামী দোলনার কাছে গেল। 'ছেলের' দিকে দেখে সে, দাড়িভরা মুখ, পাগুলো দোলনা থেকে বেরিয়ে ঝুলছে। হেসে ফেলল স্বামী, বলে:

'শুনছ, অনেক টাকা রোজগার করে এনেছি আমি, কাল ভোজউৎসব হবে ছেলের জন্ম উপলক্ষে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে লোকে ওর দেখে হাসবে। খুরটা নিয়ে এস তো ওর দাড়িটা কামিয়ে দিই।'

খুরে শান দিয়ে নিয়ে সে কাজীকে পরিষ্কার করে কামিয়ে দিল। ভয়ে কাজী একটুও নড়ল না পর্যন্ত। তারপর স্বামী বলল:

'দেখি তো বউ কুড়ুলটা নিয়ে আয় তো ওর পাগুলো কেটে ছোট করে দিই একটু, না হলে লোকে বলবে ওর পাগুলো এমন লম্বা কেন।'

মেয়েমানুষটি কুড়ুল নিয়ে এলে স্বামী সেটা দিয়ে এমন জোরে ঘা মারল কাজীর পায়ে যে কাজী লাফিয়ে উঠে পিঠে দোলনাবাঁধা অবস্থাতেই দৌড়ল দরজার দিকে। দরজায় আটকে গেল দোলনাটা দরজার বাজুতে কিন্তু বাজু ভেঙে ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল সে।

শেষে গভীর রাতে এল বাজারের তদারককারী, মেয়েমানুষটি পালকের গদী বিছিয়ে সাজগোজ করে চুল বেঁধে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'শেষে পেলাম তোমাকে।' বলল বাজারের বড়কর্তা।

'প্রেমের লগ্ন চিরস্থায়ী হোক এস আগে খেয়ে নেওয়া যাক, পোলাও তৈরী।'

এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল আর কার যেন গলা শোনা গেল।

'ও কে ?'

'আমার স্বামী।'

'কোথায় লুকোব আমি ?'

'যখন স্বামী বাড়ী ছেড়ে চলে যায় তখন প্রদীপদান ছাড়া আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মাথার ওপর পাগড়ীটা বাঁধ ভালো করে, তোমার মাথার ওপর প্রদীপটা বসিয়ে দেব আমি। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে তোমাকে ছেড়ে দেব আমি।'

মেয়েমানুষটি তার মাথার ওপর প্রদীপটা রেখে দেওয়ামাত্র স্বামী এসে ঘরে ঢুকল।

'খেতে দে, বউ !' বলল সে।

'কিছুই নেই বাড়ীতে খেতে দেবার মত।'

'আরে বাড়ীতে যে এত দামী দামী জিনিসপত্র ছিল, সেসব কোথায় গেল ?'

'এই একটামাত্র প্রদীপদানই আছে।'

'কত জায়গায় ঘুরেছি, কতরকম প্রদীপদান দেখেছি এটার মত আর দেখিনি তো। দাও তো কুড়ুলটা এটাকে একটু ঠিক করে দিই।'

'ওই তো তোমার কুড়ুলটা তোমার মাথার কাছেই।'

স্বামী কুড়ুলটা নিয়ে বাজারের কর্তার কাঁধে মারল এক ঘা। প্রদীপটা পড়ে গেল বাজারের কর্তার মাথা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে বাড়ী থেকে।

তারা তিনজনেই পেঁাছল গিয়ে এক জায়গাতেই। পরস্পরকে তারা নিজেদের কাহিনী বলল।

'মেয়েমানুষটা ঠকিয়েছে আমাদের।' এই বলে তারা প্রতিশোধ নেবে ভাবল। ওদিকে মেয়েমানুষটি চিমটি আগুনে গরম করে লাল করে নিয়ে অপেক্ষায় আছে তাদের। প্রতারিত তিনজন বাড়ীর কাছে এল কিন্তু বাড়ীতে ঢুকতে পারছে না। ভাবল তারা ছাতে উঠবে সেখান থেকে ঢুকবে গিয়ে বাড়ীতে। দেখল ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু উঁকি দিয়ে দেখতে সাহস হচ্ছে না তাদের।

শেষে মাংসওয়ালা মনে জোর এনে জানলা দিয়ে উঁকি দিল আর মেয়েমানুষটি অমনি গরম চিমটি দিয়ে তার নাক চেপে ধরল। ব্যথায় চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছিল মাংসওয়ালার, কিন্তু সে কেবল বলল:

'দেখ কেমন নাচগান হল্লা হচ্ছে ওখানে।'

কাজীরও ইচ্ছা হল দেখতে কি হচ্ছে সেখানে আর তার দামও দিল নাক দিয়ে, কিন্তু সেও সহ্য করল যন্ত্রণা চীৎকার করে উঠল না।

'হ্যাঁ মাংসওয়ালা ঠিকই বলছে।' বলল কেবল সে।

বাজারের তদারককারী তখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেল আর মেয়েমানুষটা তার পশ্চাদ্দেশ চেপে ধরল চিমটে দিয়ে। চীৎকার করে উঠল সে 'বাঁচাও, মেরে ফেললে। ও ডাইনী।'

বাড়ী ফিরে গেল তারা সবাই লজ্জায় মুখ পুড়িয়ে।

খাটিয়ে চাষী

বহুদিন আগে ছিল এক চাষী। খুব ইচ্ছা তার বড়লোক হবার। তাই সৎপরিশ্রমে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে সে জমাল তিনশ' সোনার মোহর। একটা কৌটোর মধ্যে সে রেখে দিয়েছে সেগুলোকে, প্রতিদিন সেগুলোকে ঢেলে গোনে একবার করে।

একদিন সে এমনি গুনছিল যখন তখন বাড়ীর ফটকের কাছে শুনতে পেল বন্ধুর গলা। ভয় হল তার যে বন্ধু জেনে ফেলবে তার এই সম্পত্তির কথা, তাই তাড়াতাড়ি সেগুলোকে ভরে রাখল একটা কলসের মধ্যে, তারপর গেল বন্ধুর ডাকে সাড়া দিতে। বন্ধু বলল:

'ওই বাড়ীর প্রতিবেশী তোকে আর আমাকে যেতে বলেছে। চল যাই।'

চলল তারা দু'জনে। যাক তারা, আমরা এদিকে দেখি চাষীর বাড়ীতে কি হল। তার বউ কলসটা নিয়ে জল আনতে চলল। কিন্তু নদীর কাছে অনেক লোক থাকায় সে জল নিতে পারল না, আর একজন লোক জল নিতে যাচ্ছিল দেখে তাকে বলল জল এনে দিতে। লোকটা তার হাত থেকে কলসটা নিয়ে অবাক হল সেটা ভীষণ ভারী বলে। কলসের ভিতরে তাকিয়ে দেখে সোনার মোহর তার ভিতরে। সেগুলোকে নিজের কলসের ভিতর ঢেলে নিয়ে ফাঁকা কলসে জল ভরে দিল চাষীর বউয়ের হাতে। তারপর লোকটা বাজারে গিয়ে দশ মোহর দিয়ে একটা মোষ কিনল আর বাকী দুশ' নব্বই মোহর সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চলল। পথে যেতে যেতে সে ভাবল: 'যদি এখন ডাকাত পড়ে আমার ওপর তো লুঠে নেবে মোহরগুলো। মোষটাকে একটা লুকান যায়গায় নিয়ে গিয়ে মোহরগুলো ওকে গিলতে দেব আর বাড়ীতে ওটাকে কেটে মোহর বার করে নেব।'

মোষটাকে একপাশে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মোহরগুলো গিলতে বাধ্য করল, তারপর নিশ্চিন্তমনে বাড়ী চলল। পথে দেখা হল তার ছেলের সঙ্গে। ছেলে জিজ্ঞাসা করল:

'বাড়ীর জন্য যা যা দরকার সব কিনেছ তো, বাবা ?'

'না তো কিনি নি।' বলে বাবা।

ছেলের কাছে মোষটা দিয়ে সে ফিরে চলল বাজারে আর ছেলে মোষটা নিয়ে চলল বাড়ীতে। এবার বলা যাক মোহরের মালিকের কথা। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে আমোদ আহ্লাদে সে খুব মেতে গেল। হঠাৎ এক সময় তার মনে পড়ল যে মোহরগুলো সে ঢেলে দিয়েছিল জলের কলসের মধ্যে, খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল সে, কিন্তু তারপর ভাবল বউ হয়ত লুকিয়ে রেখেছে মোহরগুলো। কিছুক্ষণ পরে সে আর তার বন্ধু বাড়ীর দিকে চলল। তারা দেখে একটা ছেলে মোষ নিয়ে যাচ্ছে। চাষী তার বন্ধুকে বলল:

'ভাই রে, কবে থেকে ভাবছি এমনি একটা মোটাসোটা মোষ কিনে কেটে গরীব মানুষের মধ্যে বিলি করব মাংস।'

ছেলেটার কাছে এসে তারা জিজ্ঞাসা করল:

'কোথায় মোষটা কিনলি রে, বাছা ?'

'বাজারে।'

'কত দিয়ে ?'

'দশ মোহরে।'

'আরও বেশী যদি দিই তোকে তো বেচে দিবি ওটা আমাদের ?'

'দেব।'

অনেকক্ষণ দরাদরি করে শেষে বেশ মোহরে রফা হল। দাম মিটিয়ে দিয়ে মোষটাকে নিয়ে বাড়ী চলল চাষী।

এবার শোন সেই ছেলেটির বাবার কথা যে মোষকে মোহর গিলিয়ে, ছেলের হাত তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে বাজারে ফিরে গিয়েছিল। বাজারে গিয়ে যা যা দরকার ছিল সব কিনে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে মোষ নেই। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল:

'হ্যাঁ রে, মোষটা কই ?'

'বাবা তুমি ওটা দশ মোহরে কিনেছিলে আমি বিশ মোহরে বেচে দিয়েছি।'

একথা শুনেই তো তার চীৎকার করে উঠল, দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, হা-হুতাশ করতে লাগল, কিন্তু বাবার কিছুই নেই। থাক ওর কথা, এবার দেখা যায় চাষী যে মোষ কিনে বাড়ীতে নিয়ে গেল তার কি হল। বন্ধুকে নিয়ে বাড়ীতে এল সে। বন্ধুকে বাইরে উঠোনে বসিয়ে ঘরে ঢুকে কলসের মধ্যে তাকাল, কিন্তু কলসের মধ্যে মোহর নেই। চীৎকার করে উঠল সে:

'বউ রে, এই কলসে রাখা মোহরগুলো কোথায় ?'

বউ বলল যে কলস নিয়ে জল আনতে গিয়েছিল। চাষী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হা-হুতাশ করতে লাগল, কিন্তু মোহরগুলো যে খুইয়েছে তা তাকে মেনে নিতে হল। বন্ধুকে বলল:

'বন্ধু রে, এই মোষটাকে কাট, গরীবদের মধ্যে মাংস বিলোব আমি।'

বন্ধু মোষটা কেটে নাড়ীভুঁড়ি পরিষ্কার করত লাগল। চাষী তখন নিজের মোহরগুলো দেখতে পেয়ে দারুণ খুশী হল। প্রতিটি মোহরকে ধুয়ে, ঘষে পরিষ্কার করে চুমো খেয়ে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল যে আর কোনদিনও সেগুলোকে হাতছাড়া করবে না সে।

একদিন চাষী নদীতে নেমে চান করছে এমন সময় তার মোহরের থলিটা, যেটা সে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখে, পড়ে গেল জলে। জল থেকে উঠে এসে দেখে মোহর নেই। আবার জলে নেমে খুঁজল অনেক, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেল না। ভাবল 'বোধহয় স্রোতে টেনে নিয়ে গিয়েছে মোহরগুলো। এবার আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না ওগুলো।' ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বাড়ী ফিরে চলল সে। বহুদিন ধরে শোক ভুলতে পারল না সে, লোকের চোখের আড়ালে কাঁদে আর মনের দুঃখে কবিতা লেখে।

এবার দেখা যাক নদীতে পড়ে যাওয়ার পরে মোহরগুলোর কি হল। নদীর তীরে রাখাল ভেড়ার পাল চরাচ্ছিল। খুব গরম লাগাল রাখাল নদীতে কয়েক ডুব দিয়ে নেবে ভাবল। জলে নামতেই তার পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। ডুব দিয়ে সে তুলে আনল মোহরভরা থলিটা। জল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে পোশাক পরে নিয়ে মেহারের থলিটা লুকিয়ে রাখল জামার মধ্যে। আনন্দে সে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। ভেবে ভেবে সে মোহরগুলো লুকিয়ে রাখার একটা মতলব বার করল। নিজের লাঠিটাকে ভাঙল সে, তার মধ্যের সবকিছু চেঁচে ফেলে দিয়ে ফাঁকা যায়গাটায় ঢুকিয়ে দিল মোহরগুলো।

এর পর একদিন পালের একটা ভেড়া পিছিয়ে পড়ল পাল থেকে। রাখাল রেগে গিয়ে তার দিকে লাঠিটা ছুঁড়ল, লাঠিটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। লাঠিটা পাবার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন রাখাল পেল না সেটাকে কিছুতেই। শোকে দুঃখে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল আর কাঁদতে লাগল সে।

দুঃখ করুক সে ততক্ষণ, দেখা যাক ওদিকে মোহরগুলোর মালিক সেই চাষীর কি হল। নদীর তীরে তার জমির যে অংকাটা সেখানে সে জল দিচ্ছিল খেতে হঠাৎ দেখে জলে ভাসছে রাখালের লাঠি। সেটাকে তুলে নিল সে, বেশ ভারী বোধ হল। লাঠিটাকে দুটুকরো করল সে, তার ভিতরে পেল নিজের হারিয়ে যাওয়া মোহরগুলো। সেগুলো জলে ধুয়ে, আদর করে বারবার গুনতে লাগল। তারপর আলখাল্লার প্রান্তে সেগুলো বেঁধে নিয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ী চলল। বাড়ীতে এসে বউকে বলে:

'ওগো শুনছ, আমি হারানো মোহরগুলো পেয়েছি, আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও।'

স্ত্রীর হাতে মোহরগুলো দিয়ে লুকিয়ে রাখতে বলল।

এবার দেখা যাক যে রাখালের লাঠি নদীতে পড়ে গিয়েছিল তার কি হল। ভেড়ার পাল মনিবের জিম্মায় দিয়ে এসে সে নদীর ধার বরাবর চলতে লাগল, চলতে চলতে এসে পৌঁছল সেই চাষীর বাড়ী পর্যন্ত। চাষীর অতিথি হল সে, চাষী অতিথির যোগ্য সমাদর জানাল। রাখাল কেন যেন বিষণ্ণ আর চাষী তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

'বল প্রিয় অতিথি, তোমার বিষাদের কারণ কি?'

'ভাই রে, ভেড়া চরাচ্ছিলাম আমি। খুব গরম সেদিন, ভাবলাম কয়েক ডুব দিয়ে নেব। জলে আমি কিছু খুঁজে পেলাম, সেই খুঁজে পাওয়া জিনিসটা লুকিয়ে রাখলাম আমার লাঠির মধ্যে। লাঠিটা রাখতাম সবসময় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একদিন যখন আমি ভেড়ার পাল চরাচ্ছিলাম নদীর তীরে তখন একটা ভেড়া পিছিয়ে পড়লে আমি তার দিকে লাঠিটা ছুঁড়ি রেগে গিয়ে। লাঠিটা মাটিতে ঠোকা খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীতে। কত ধরবার চেষ্টা করলাম লাঠিটাকে পারলাম না। লাঠিটাকে ধরার আশা ছেড়ে দিলাম, ভাগ্যকে মেনে নিতে হল। আর এখন দেখছ শোকে অধীর আমি, এমনকি ভেড়াও চরাই না আর।'

চাষী তার কাহিনী শুনে মনে মনে ভাবল: 'এই হল সে লাঠির মালিক যেটা নদীতে পড়েছিল। স্রোতে লাঠিটা নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। সেটাকে ভেঙে ভিতরে মোহরগুলো দেখতে পাই, ভাবলাম ওগুলো আমার, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে ওগুলো এই লোকের।'

স্ত্রীর কাছে গিয়ে চাষী বলল:

'ওগো শুনছ, আমি ভেবেছিলাম নিজের মোহর খুঁজে পেয়েছি, এখন দেখছি ওগুলো এই অতিথির। ওগুলো ওকে দিয়ে দিতে হবে।'

স্ত্রী বলল: 'ফিরিয়ে দাও, কিন্তু আমরা যে কিছু মোহর খরচ করেছি, তার কি হবে?'

চাষী বলল: 'যা খরচ করেছি তাও দিয়ে দিতে হবে।'

চাষী আর তার স্ত্রী মোহরগুলো নিয়ে অতিথির হাতে তুলে দিয়ে বলল:

'এই যে তোমার মোহরগুলো, আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। এর থেকে কিছু আমরা খরচ করেছি, সেগুলোও ফিরিয়ে দেব যখন যোগাড় করতে পারব।'

অতিথি খুশী হয়ে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে মোহরগুলো নিয়ে বাড়ী চলে গেল। আবার সে ভেড়া চরাতে লাগল আর মোহরগুলো কাছ ছাড়া করে না কখনও।

একদিন সে স্তেপে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে এমন সময় দূরে দেখা গেল, ঘোড়ায় চড়া কতকগুলো লোককে। রাখাল ভয় পেয়ে গেল, ভাবল ওরা লুঠেরাদস্যু, তাই ঠিক করল মোহরের থলিটা কূয়োর মধ্যে ফেলে দেবে তারপর দস্যুগুলো চলে গেলে পরে কূয়া থেকে তুলে আনবে থলিটা। তাই করল সে: থলিটা ফেলে দিল কূয়ার মধ্যে তারপর যখন ঘোড়ায় চড়া লোকগুলো চলে গেল তখন কূয়াতে নেমে খুঁজতে লাগল তার মোহরের থলিটা, কিন্তু খুঁজে পেল না। রাখাল বেরিয়ে এল কূয়া থেকে ভেড়ার পালের কাছে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগল, কিন্তু করার কিছু নেই।

এবার দেখা যাক চাষীর কি হল। লোকের কাছে ঐ কূয়ার জলের গুণের কথা শুনে সে ভাবল ঐ কূয়ার নেমে কয়েক ডুব দেবে।কূয়ার কাছে এসে জামাকাপড় ছেড়ে জলে নামল। জল তলে পা ঠেকতেই কি যেন একটা লাগল পায়ে। ডুব দিয়ে চাষী তুলে আনল মোহরের থলিটা। পোশাক পরে নিয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলল:

'শুনছ, অতিথিকে যে মোহরগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো আবার খুঁজে পেলাম৷ রেখে দাও এগুলো। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।'

কয়েকদিন বাদে রাখাল আবার তার কাছে এসে বলল যে আবার সে মোহরের থলি হারিয়েছে। তার সব কথা শুনে চাষী বলল:

'তোমার, আমার দু'জনেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে সত্যি করে বল তো ভাই, কোথায় প্রথমবার তুমি খুঁজে পাও মোহরগুলো ? ওগুলো তোমায় যখন ফিরিয়ে দিলাম আমি তার আগে তুমি কোথায় সেগুলো হারিয়েছিলে ? আবার ওগুলো হারালে তুমি, আবার এসেছ আমার কাছে। সত্যি করে বল তো, ওগুলো আমার না তোমার মোহর ?'

'ভাই রে, ও তোমারই মোহর, আমি শুধু শুধু ওগুলো খুঁজে খুঁজে সময় নষ্ট করেছি দুবার।' বলল রাখাল।

বিদায় নিল রাখাল আর গরীব চাষী যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সঞ্চয় করেছিল ঐ ধন তা চিরকালের মত তারই রইল।

শুনলে তো সৎপথে উপার্জন করা অর্থের কাহিনী। যে পরিশ্রমের মাধ্যমে সঞ্চয় করে তার সম্পত্তি খোয়া যায় না কখনও।

দুই কিপটের গল্প

সমরখন্দে এক বাই থাকত, আর এক বাই থাকত পাহাড় এলাকায়। যে পাহাড়ী এলাকায় থাকত সে ছিল আশ্চর্য কিপ্পণ। তার ছিল কতকগুলো ভেড়ার পাল, কতকগুলো ঘোড়ার পাল, কয়েকজন খেতিমজুর আর তিন বউ। সমরখন্দের বাইও কম যেত না তার কাছে কিপটেমিতে: ধনসম্পত্তি তারও কম ছিল না: টালির তৈরী বাড়ী, ঘোড়ার পাল, ভেড়ার পাল। কিন্তু সে এমনকি গরীব মানুষকে একটুকরো রুটিও দিত না, কখনও ভিক্ষা দিত না, দিনমজুর রাখত না, সব কাজ নিজে করার চেষ্টা করত।

সমরখন্দের বাইয়ের স্ত্রী যুবতী, তার মোটেই লাগে না বাইয়ের এই কিপটেমি। সে প্রতিজ্ঞা করল যে তার স্বামী মরে গেলে সে আবার বিয়ে করবে এক উড়নচণ্ডীকে।

বাই মরে গেল শেষে। ছেলেমেয়ে ছিল না তার, সব ধনসম্পত্তি পেল তার স্ত্রী। এক জুয়াড়ীকে বিয়ে করল সে, তাকে রেশমী পোশাক পরিয়ে তার হাতে দিল অনেক টাকা খরচ করার জন্য। জুয়াড়ী তো খুব টাকা ওড়াতে লাগল বন্ধুদের সঙ্গে মদ খেয়ে, স্ফূর্তি করে। বাইয়ের মাথাটা কেটে রেখে দিয়েছিল তার বউ, প্রতিদিন খাওয়াদাওয়া সারা হলে সে আর তার নতুন স্বামী দু'জনে মিলে লাঠি দিয়ে মাথাটাকে মারে আর বলে:

'তোমার সম্পত্তি তুমি নিজে ভোগ কর নি, দেখ আমরা কেমন ভোগ করছি।'

এমনি ভাবে বেশ স্ফূর্তিতে কাটতে লাগল তাদের দিন।

যে বাই পাহাড়ী এলাকায় থাকত সে একদিন শহরে এল দরকারে। বাজারে কতকগুলো ভেড়া বেচে সে কিনল একটা ভেড়ার মাথা যেটা পচতে আরম্ভ করেছে, কিনল পচা শাকসব্জী তরকারী, পোকাধরা চাল, শক্ত বাসী রুটি, হলদে হয়ে যাওয়া শসা, এ সব কিনে বাড়ীর পথ ধরল। কিন্তু সন্ধ্যের আঁধার নামায় সে শহরেই রাতটা কাটাবে ঠিক করল। কাছেই একটা

বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল সে। সে হল সেই মৃত বাইয়ের বাড়ী। অতিথির পোশাক-আশাক নোংরায় ভর্তি, জুতো ছেঁড়াখোঁড়া, এমন কি কুকুরেরও তার সঙ্গে বসে খেতে ঘেন্না হবে। কিন্তু বাড়ীর মালিক স্বামী-স্ত্রী সমাদর জানিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল অতিথিকে, নরম বিছানায়, রেশমী কম্বলের উপর শুতে দিল। বিভিন্ন রকমের খাবার দাবার এনে রাখল তার সামনে। মৃত বাইয়ের মাথাটাও আনা হল। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল:

'মাথাটা এখন পিটাব নাকি খাবার পরে ?'

'খাবার পরে', বলল স্বামী।

খাওয়াদাওয়া সারল তারা, তারপর মাথাটায় লাঠি পিটতে লাগল আর বলতে লাগল:

'যারা নিজেরা জীবন থাকতে নিজের ধন ভোগ করে না তাদের এমনি দশাই হয়।'

অবাক হল অতিথি। সকালবেলায় যখন অতিথির সামনে চা আনা হল সে জিজ্ঞাসা করল:

'মাথাটাকে পিটাচ্ছিলে কেন তোমরা ?'

'আমি ঐ বাইয়ের স্ত্রী ছিলাম', বলল মেয়েমানুষটি, 'সমরখন্দের সবচেয়ে ধনী ছিল সে, কিন্তু এক কপর্দকও খরচ করত না সে। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করি ও মরলে বিয়ে করব এক উড়নচণ্ডীকে। সে মরলে এই মাতালটাকে বিয়ে করি। প্রতিদিন বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসে ও ভোজ হয় প্রতিদিনই।'

তার কথা শুনে বাই যখন তাদের বাড়ী থেকে বেরোল যা কিছু সে বাজারে কিনেছিল সব ছুঁড়ে ফেলে দিল স্তেপে, বাড়ীতে ফিরে একটা ভেড়া কাটতে আদেশ দিল। তার এমনি পরিবর্তন দেখে তার বউয়েরা ভীষণ অবাক হল, জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হয়েছে তার। বাই বলল:

'তোদের বাপমা চুলোয় যাক! তোদের জাতের একজনকে দেখলাম। আমি মরলে তোরাও মাতালকে বিয়ে করে আমার সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দিবি। তার চেয়ে আমি নিজেই উড়োব আমার টাকা।'

সেই থেকে বাই অর্থ দান করতে লাগল বিদ্যালয় নির্মাণে, গ্রাম উন্নয়নে, গ্রামে সবার জন্য তৈরী করে দিল যাঁতাকল, তেলের ঘানি আরও অন্যান্য ভাল কাজে ব্যয় করল নিজের ধনসম্পত্তির অর্ধেক।

ধূর্ত কবি

একসময় বুখারাতে ছিল এক চারণকবি। তার খুব সুন্দর গলা ছিল। প্রতি শুক্রবারে মসজিদের সামনে লোক জড় করে তার রচিত বিভিন্ন কাহিনী শোনাত। লোক জড় হত সবসময়ই প্রচুর। একদিন সে কাহিনী শেষ করার পর লোকদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল এই বলে: 'ভাইরা, খোদার দয়ায় আমি জাদুর ভেলকী দেখাতে জানি। তোমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু করে দাও আমি তোমাদের জাদুর ভেলকী দেখাব।'

লোকেদের জাদুর ভেলকী দেখতে ইচ্ছে হল তাই তারা সবাই পয়সা দিল। কবি সব পয়সাগুলো নিয়ে বলল:

'ভাইরা, আজ দেরী হয়ে গেছে খোদাবন্দের ইচ্ছা যে আজ আমি যেন ভেলকী না দেখাই। পরের শুক্রবারে দেখতে পাবে ভেলকী।'

কবি বাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। লোকেরাও বাড়ী চলে যেতে যেতে বলাবলি করতে লাগল: 'ঐ কবিটা, ওর বাপের মুখ পুড়ুক, ঠকাল আমাদের।' তিনজন লোকের ভীষণ রাগ হল, তারা ঠিক করল:

'ঠগটাকে ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। ওকে ধোলাই না দিলে হিসাব মেটান যাবে না ওর সঙ্গে।'

তারাও চলল কবির পিছন। কবি থাকত বুখারার মাদ্রাসাতে। ঘরে এসে সে ডেকচি উনুনে চাপিয়ে পোলাও রান্না করতে আরম্ভ করল, এমন সময় হুড়মুড় করে তার ঘরে এসে ঢুকল সেই তিনজন যারা তাকে ধোলাই দিতে চেয়েছিল। কবি বুঝল ঠিকই কি জন্য এসেছে তারা, কিন্তু বসতে বলল তাদের:

'আসুন, আসুন, অতিথিরা আসতে আজ্ঞা হোব। ঠিক সময়েই এসেছেন। এখুনি পোলাও তৈরী হয়ে যাবে। ততক্ষণ আসুন চা খাওয়া যাক।'

প্রত্যেকের দিকে পেয়ালা এগিয়ে দিল সে। অনাহূত অতিথিরা দেখল সত্যিই পোলাও প্রায় তৈরী, চোখ টেপাটেপি করে ঠিক করল প্রথমে খেয়ে নেবে তারপর শিক্ষা দেবে। বসল তারা, কবি তাদের সামনে চা এগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে ওদিকে:

'যখন বয়স কম ছিল খুব মিষ্টি গলা ছিল আমার। সপ্তাহে একদিন করে আমি কাহিনী শোনাতাম আমীর দরওয়াজার কাছে, গোটা বুখারার লোক জড় হত আমার কাহিনী শুনতে। একদিন যখন আমি বলছি আমার কাহিনী, দেখি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী আমার কথাগুলো শুনছে প্রচণ্ড আগ্রহে। সেদিকে তাকিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। প্রতিদিন যেতে লাগলাম দরওয়াজার কাছে। যেই কাহিনী বলা আরম্ভ করতাম অমনি এসে দাঁড়াত মেয়েটি, চুরি করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতাম আমি। ক্রমশ আমার মনে জ্বলে উঠল প্রেমের আগুন। শেষে একদিন মাঝরাতে এলাম আমি দরওয়াজার কাছে, অনেকক্ষণ ঘুরলাম দরওয়াজার কাছে পিঠে যতক্ষণে না প্রহরীদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকতে পারলাম ভিতরে। চারদিক অন্ধকার, কেবল একটা ঘরে আলো জ্বলছে। জানলায় উঁকি দিয়ে দেখি সে ঘরে ঘুমোচ্ছে চল্লিশটি মেয়ে। মনে মনে বললাম: 'আমার হৃদয়ের অধিকারিনীও নিশ্চয়ই এখানে।' ঢুকলাম ঘরে, মেয়েরা রূপে একে অপরকে হার মানায়। ভাবলাম: 'এদের মধ্যে কে সেইজন যে আমাকে এমন নির্ভয় করে তুলেছে?' দেখি, শুয়ে আছে সে একেবারে সবার মাঝখানে, তার মাথার কাছে রয়েছে বাতিদান, তাতে জ্বলছে চল্লিশটা বাতি। তার কাছে এগিয়ে যাব ভেবে যেই এগিয়েছি ধাক্কা লেগে গেল একটি মেয়ের গায়ে। মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল, সে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করতে লাগল:

'বাবা গো, মা গো, চোর, চোর!'

কবি হাত তালি দিয়ে আবার চীৎকার করল:

'বাবা গো, চোর, চোর, ধর!'

সে চীৎকার শুনে উঠোন থেকে ছুটে এল মাদ্রাসার ছাত্ররা। কবি অনাহূত অতিথিদের দেখিয়ে তাদের বলল:

'ওই যে চোর, মার ওদের!'

ছাত্ররা তাদের ধরে মারতে মারতে বার করে দিল মাদ্রাসা থেকে। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচল তারা।

আর কবি নিজের এই চাতুরীতে খুব খুশী হয়ে হাঁড়িভর্তি পোলাও রান্না করে তার রক্ষাকর্তাদের সবাইকে খাওয়াল পেটভরে।

হাসান ও নেকড়ে

একসময় এক মহাপ্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। প্রচুর ধনসম্পদ তাঁর কোষাগারে, তিনটি ছেলে তাঁর বেড়ে উঠছে। কিন্তু ধনসম্পদ বা তিন ছেলে কোনকিছুই বাদশাহ্‌র মনে আনন্দ দিতে পারে না।

সব সময়ই মন খারাপ তাঁর। তাঁর সভাসদরা বা ছেলেরা যত চেষ্টাই করুক না কেন তাঁর মনে খুশী আনার কিছুতেই কিছু হয় না।

একদিন তাঁর কাছে প্রধান উজীর এসে বলল: 'তোমার এই বিষাদ ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের মনেও। তোমার এত ক্ষমতা — যা চাও বল, আদেশ দাও, আমোদে মাত।'

'নিজেই বুঝি না আমি কেন আমার এ বিষাদ, কিছু ইচ্ছা করে না আমার।' উত্তর দিল বাদশাহ।

উজীর বলল: 'তাহলে তোমার সেরা ঘোড়াগুলোকে সাজাতে বল। নিজের পারিষদের দল নিয়ে আপনার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ কর। হয়ত পথে পড়বে এমন কোন জিনিস যাতে আগ্রহ জাগবে মনের বিষাদ দূর হবে।'

প্রধান উজীরের উপদেশ মেনে বাদশাহ পারিষদদের এক বিরাট দল নিয়ে, তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণে বেরোলেন।

শহর প্রদক্ষিণ করে সব মাঠবসতি ঘুরে, নিজের উনচল্লিশটা বাগান দেখলেন, কিন্তু এমন কিছু দেখতে পেলেন না যা দূর করতে পারে তাঁর মনের বিষাদ।

প্রাসাদে ফিরে যেতে চাইলেন তিনি, কিন্তু উজীর তাঁকে বলল চল্লিশতম বাগানটিতেও যেতে: হয়ত সেখানে তিনি বিশেষ কোন কিছু দেখতে পাবেন।

চল্লিশতম বাগানটি সব বাগানের চেয়ে সুন্দর। সেখানের ঘাস পাতা, ফুল অন্যান্য বাগানের চেয়ে আরও সুন্দর।

4 — 1363

বাগানের মাঝখানে সবুজ ঘাসঢাকা মাটিতে উঠেছে একটা বড় গাছ, একটাও পাতা নেই সে গাছে। বাদশাহ্‌র জানতে ইচ্ছা হল কি গাছ সেটা।

'এ গাছটি অতি দুষ্প্রাপ্য ও বিস্ময়কর', বলল মালী, 'প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটায় গাছটায় চূড়ায় কুঁড়ি ধরে, সাতটার সময়ে গাছটা পাতায় ভরে যায় আর নটা নাগাদ ফুল ফোটে আর বারোটা নাগাদ ফলে পাক ধরে। কিন্তু মাঝরাতে একটা অজানা পাখী উড়ে এসে গাছে বসে, তাড়াতাড়ি ফলটা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে চলে যায়।

'কেউ এই গাছের ফলটা পাড়ে যেন আর যে পাখীটা ফল খায় তাকে ধরে।' বললেন বাদশাহ।

বাদশাহ্‌র ছোট ছেলে হাসান বাবার আদেশ পালন করার ভার নিল।

সবাই বাগান ছেড়ে চলে গেলে হাসান একা রইল গাছটার তলায়। গোটা সন্ধ্যাটা গাছ তলায় বসে কাটাল, কিন্তু ফলে যখন ঠিক পাক ধরার সময় তখনই গভীর ঘুমে কখন যে সে ঢলে পড়ল নিজেই বুঝতে পারল না ছেলেটি।

ভোরবেলায় বাদশাহ্‌র দূত বাগানে এসে বলল যে বাদশাহ অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে আছেন ছেলের ফিরে আসার জন্য।

নিজের ব্যর্থতায় অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল শাহজাদার, তার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল বাবাকে একটুখানি খুশী করতে যাতে তার মনের ভার দূর হয়। হাসান বাবাকে জানাতে বলল যে পরের দিন রাত্রে সে যেমন করেই হোক পূরণ করবে বাবার ইচ্ছা।

দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিল হাসান, যাতে রাতের বেলায় পাখীটার ওপর চোখ রাখা যায় আর ফলটা পাওয়া যায়, কিন্তু সে রাতেও যখন ফলে পাক ধরল আর পাখী উড়ে এল হাসান আবারও ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অলক্ষ্যে, দেখতে পেল না কিছুই।

ভোরবেলায় বাদশাহ্‌র দূতরা হাসানকে জানাল যে তার ব্যর্থতার কথা শুনে বাদশাহ আরও ভেঙে পড়েছেন। হাসান ঠিক করল তৃতীয় রাতেও ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে সে।

সেদিন ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে সে জেগে বসে রইল মাঝরাত পর্যন্ত। দেখল কেমন করে ফুল ফুটল গাছে, তারপর যেই ফলে পাক ধরতে আরম্ভ করল অমনি উড়ে এল একটা পাখী, কিন্তু পাখীটা সেখানে মানুষ দেখতে পেয়েই উড়ে পালিয়ে গেল। পাখীটার দিকে তীর ছুঁড়ল হাসান কিন্তু মেরে ফেলল না কেবল তার পাখনা থেকে খসে পড়ল একটা বড় পালক। পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে গাছের ফলটা ছিঁড়ে নিয়ে বাবার কাছে গেল হাসান।

খুব খুশী হলেন বাদশাহ। অদ্ভুত পাখীটার পালকটা লক্ষ্য করে সবাই দেখল যে তার ওপর কি সব অজানা অক্ষর লেখা, বাদশাহ্‌র ভীষণ ইচ্ছা হল পাখীটাকে দেখার। তখন হাসান বাবার অনুমতি চাইল পাখীটাকে খুঁজতে যাবার, বাদশাহ অনুমতি দিলেন তাকে।

অনেক দিন ঘুরল হাসান, অনেক পথ চলল, কিন্তু সেই পাখীর কথা শোনে নি কেউ।

একদিন পথে ঝড় উঠল। বালির একটা বিরাট স্তম্ভ ছুটে এল হাসানের দিকে। শাহজাদার ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। হঠাৎ সেই বালির স্তম্ভটা থেকে লাফিয়ে

বেরিয়ে এল একটা নেকড়ে, হাসানের কাছে এসে খাবার কিছু চাইল তার কাছে। হাসান থলি থেকে একটা রুটি বার করে ছুঁড়ে দিল নেকড়ের দিকে। নেকড়ে রুটিটা খেয়ে নিয়ে বলল:

'তুমি সাহসী আর মনটা তোমার ভাল, আমি তোমার কাজে লাগতে চাই।'

হাসান নেকড়েকে বলল কোথায় আর কেন যাচ্ছে সে।

'যতই পথ চল না কেন কিছুতেই খুঁজে পাবে না তুমি', বলল নেকড়ে। 'তুমি আমাকে দয়া দেখিয়েছ বলে আমিও তোমায় সাহায্য করব। নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে আমার পিঠে বস পিছনদিকে মুখ করে আর লেজটা ধরে থাক নাহলে পড়ে যাবে। এর পরে কি করতে হবে পরে জানতে পারবে।' বলল নেকড়ে।

ঘোড়া থেকে নেমে হাসান তার লাগাম খুলে চরতে ছেড়ে দিল আর নিজে উঠে বসল নেকড়ের পিঠে। হাসান নেকড়ের লেজটা ধরতে না ধরতেই নেকড়েটা বাতাসের গতিতে ছুট লাগাল বন, পাহাড়, স্তেপ পেরিয়ে একেবারে সোজা সেই রাজ্যের দিকে যেখানে আছে সেই অদ্ভুত পাখীটা।

নেকড়েটা হাসানকে নিয়ে এল এমন এক বনে যেখানে অনেক পাখী আর জন্তু।

হাসান শিকার করে নিজের আর নেকড়ের জন্যও খাবার যোগাড় করল।

সন্ধ্যা নামল।

নেকড়ে বলল: 'এবার শহরে যাও, চল্লিশটা ফটক পেরিয়ে যাবে। প্রতিটি ফটকের কাছে দু'জন করে ডান ঘুমোচ্ছে। সোজা ঢুকে যাবে ফটকের মধ্যে দিয়ে, ডাইনগুলোর ঘুম ভাঙবে না। চল্লিশটা ফটক পেরিয়ে গেলে দেখতে পাবি সোনার খাঁচা, আর খাঁচায় সেই পাখীটা যেটাকে তুমি খুঁজছ। পাখীটা নিয়ে আর কোনদিকে না তাকিয়ে চটপট ফিরে আসবে।'

নেকড়ে যেমন যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি করল হাসান। সোনার খাঁচার সেই আশ্চর্য্য পাখীটা রয়েছে দেখল যেটা তার বাবার বাগানে উড়ে আসে।

পাখীটার থেকে বেরোচ্ছে কেমন এক উজ্জ্বল জ্যোতি। কিন্তু যখন হাসান পাখীটাকে খাঁচা থেকে বার করে নিল তখন মনে হল যেন সেই জ্যোতিটা তার পিছনে পড়ে রইল। কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে পিছন ফিরল হাসান।

যে দাঁড়টার ওপর পাখীটা বসেছিল তার থেকে সূর্যের আলোর ছটা বেরোচ্ছে। হাসানের ইচ্ছা হল দাঁড়টাও সঙ্গে নিতে। আর যেই সে দাঁড়টা ছুঁয়েছে অমনি বেজে উঠল অনেকগুলো ঘণ্টা আর চারদিক থেকে ছুটে এল প্রহরীর দল; দাঁড়ের থেকে সুতো গিয়ে পৌঁছেছিল প্রতিটি প্রহরাচৌকির কাছে আর সুতোর শেষে বাঁধা ছিল রুপোর ঘণ্টা — সেই ঘণ্টাগুলোই প্রহরীদের ঘুম ভাঙিয়েছে।

প্রহরীরা হাসানের হাত থেকে পাখীটা নিয়ে নিল আর তাকে নিয়ে চলল পাখীর মালিকের কাছে। পাখীর মালিক শাহজাদার মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিল। হাসান তাকে অনুরোধ করল তার কথা শুনতে, বলল সে তার সব কথা, পাখীর মালিকের মায়া হল তার জন্য, মাথা কাটার আদেশ প্রত্যাহার করে নিল, এমনকি বলল যে তাকে পাখীটা দিয়ে

দিতেও পারে যদি হাসান তার বদলে এনে দিতে পারে প্রতিবেশী রাজ্যের বাদশাহ্‌র চল্লিশটি সুন্দরী কন্যার সবচেয়ে সুন্দরী যে তাকে।

বিষণ্নমনে হাসান নেকড়ের কাছে ফিরে এসে বলল যা যা ঘটেছে সব কথা।

রেগে গেল নেকড়ে হাসানের ওপর, তাকে বনের মাঝে একা ফেলে চলে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু শোকাক্রান্ত হাসানের দিকে তাকিয়ে মায়া হল তার জন্য, বলল যে তাকে সাহায্য করবে সে এবারও।

আবার নেকড়ের পিঠে বসল হাসান, নেকড়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল সেই বাদশাহ্‌র রাজ্যের দিকে যার চল্লিশটি কন্যা ছিল। নেকড়ে এসে থামল একেবারে শহরের সীমানায়। সন্ধ্যার আঁধার নামলে নেকড়ে হাসানকে বলল:

'তুমি এবার ঢোক গিয়ে শহরে। শহরের প্রবেশপথে শুয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর জন্তু। ওকে ভয় না করে এগিয়ে যাবে সোজা। শহরে দেখতে পাবে একটা বড় প্রাসাদ, সেই প্রাসাদেই থাকে শাহজাদীরা। দাসদাসীরা ঘুমিয়ে থাকবে, কোন ভয় না করে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে। সপ্তম ঘরটিতে যাবে — সেখানেই ঘুমিয়ে আছে সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাটি। তাকে দু'হাতে করে তুলে নিয়ে চলে আসবে। কেবল চলে আসার সময় পিছন ফিরে তাকিও না।'

নেকড়ে যেমন যেমন বলেছিল: ঠিক তেমনই সব কিছু ঘটল। সপ্তম ঘরে ঘুমিয়ে থাকা শাহজাদীর কাছে পেঁছাল হাসান। কিন্তু যেই তাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে অমনি পিছনে একটা টুংটাং আওয়াজ উঠল।

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে হাসান পিছু ফিরল, দেখে মাটিতে পড়ে গেছে শাহজাদীর সোনা-মণিমুক্তোবসান শালটা। নীচু হয়ে সেটিকে কুড়োতে গেল হাসান, কিন্তু সেটি ছোঁয়ামাত্রই চারদিক থেকে ছুটে এল দাসদাসীরা, অজানা লোকটিকে দেখে চীৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল।

হাসানকে নিয়ে যাওয়া হল বাদশাহ্‌র কাছে। বাদশাহ তার মাথাটা কেটে ফেলতে চাইল। কিন্তু শাহজাদা হাসান বাদশাহকে অনুরোধ করল তার কথা শুনতে, বলল তাকে সব ঘটনা।

হাসানকে পছন্দ হল বাদশাহ্‌র।

'পাখীর মালিককে আমি আমার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে দিয়ে দেব মহামূল্য শালটা সমেতই', বলল বাদশাহ, 'কিন্তু তার বদলে আমার চাই পাহাড়ে থাকে যে ডাইন তার হলুদ রংয়ের ঘোড়াটা।'

হলুদ রংয়ের ঘোড়াটা বাদশাহকে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুতপ্ত হাসান ফিরে এল নেকড়ের কাছে।

তার কথা না শোনার জন্য নেকড়ে এমন রেগে গেল হাসানের ওপর যে তাকে আঘাত পর্যন্ত করে বসল আর তাকে একা ফেলে চলে যেতে চাইল। কিন্তু চোখভরা জল নিয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল শেষ বার সাহায্য করার জন্য।

আবার দয়া করল তাকে নেকড়ে — তার মনে পড়ল যে হাসান তাকে রুটি খেতে দিয়েছিল।

আবার হাসানকে নিজের পিঠে পিছন দিকে মুখ করে বসিয়ে ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে যেখানে থাকে সেই ডাইন। শেষে পাহাড়ের নীচে এসে নেকড়ে হাসানকে বলল:

'দেখো এবার ঠিক ঠিক আমার নির্দেশমতো কাজ কোরো। আর বাঁচাতে পারব না তোমায়। পাহাড়ে উঠে একটা বড় বাড়ী দেখতে পাবে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকবে। তৃতীয় ঘরটিতে ঘুমোচ্ছে ডাইনটা ওর গলায় চাবিগুলো ঝুলছে। ওর ঘুম খুব গভীর। ভয় পেও না ওকে। চাবিগুলো খুলে নিয়ে এগিয়ে যাবে। দুটো ঘর দেখতে পাবে, একটিতে আছে অনেক পেরেক আর অন্যটিতে — রেশমী দড়ি। প্রথম ঘরটায় ঢুকবে আগে নেবে উনিশটা পেরেক। তারপর অন্য ঘরটার ঢুকে আটত্রিশ গজ দড়ি কেটে নেবে। এর পর যাবে আস্তাবলে যেখানে হলুদ রংয়ের ঘোড়াটা আছে। সেখানে আস্তাবলের কোণায় একটা মস্ত বড় গর্ত খোঁড়া আছে। যেই তুমি ঢুকবে আস্তাবলে ঘোড়াটা অমনি ডেকে উঠবে, তুমি চট করে দড়িটা থামে বেঁধে নিয়ে গর্তে নেমে পড়বে। ঘোড়াটা ডাকছে শুনে ডাইনটা ঘুম ভেঙে আসবে আস্তাবলে, ঘোড়ায় উঠে দেখতে যাবে কোন লোকজন আছে নাকি ধারেকাছে। কাউকে না দেখতে পেয়ে ফিরে এসে ঘোড়াটাকে আবার তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে ঘুমোতে চলে যাবে। তখন তুমি গর্ত থেকে মাথা বার করবে। আবার ডেকে উঠবে ঘোড়াটা। আবার ঘুম ভেঙে আসবে ডাইনটা ঘোড়ার পিঠে বসে দেখতে যাবে বাইরেটা। কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার গিয়ে ঘুমোতে শোবে। আবার মাথা বার করবে তুমি গর্ত থেকে — তৃতীয়বার ডেকে উঠবে ঘোড়াটা। তৃতীয়বার ডাইনটা জেগে উঠে এসে ঘোড়ায় চড়ে তার রাজ্য দেখতে বেরোবে। কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে ঘোড়াকে বকবে শুধু শুধু তার ঘুম ভাঙানর জন্য, ঘোড়ার খাবারের পাত্রটা থেকে কিসমিস নিয়ে নেবে তার বদলে হাড় খেতে দিয়ে বলবে: 'এবার যতই ডাক না কেন আর আসব না তোর কাছে, মিথ্যুক!' বলে ঘুমোতে চলে যাবে। তখন তুমি চট করে বেরিয়ে আসবে গর্ত থেকে। হাড়ের বদলে ঘোড়াকে খেতে দেবে কিসমিস। এতে খুশী হবে ঘোড়াটা, ডাকবে না। তখন তুমি সেই ঘরে যাবে যেখানে ডাইনটা ঘুমোচ্ছে, তার পোশাকটা মাটিতে পেরেক ঠুকে ঠুকে আটকে দেবে। তার ঘুম ভেঙে গেলেও উঠতে পারবে না। যতক্ষণে সে পেরেকগুলো ছাড়াবে ততক্ষণে তুমি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসবে আমার কাছে।'

এবার হাসান নেকড়ের কথামত সবকিছু ঠিক ঠিক করল, মাঝরাতে সে এসে পেঁছিল নেকড়ের কাছে হলুদ রংয়ের ঘোড়ায় চড়ে। নেকড়ে তার সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করল, তারপর তারা রওনা দিল সেই বাদশাহের দেশের উদ্দেশ্যে, যে ঘোড়ার বদলে নিজের সুন্দরী মেয়েকে দেবে বলেছিল।

প্রাসাদের কাছে পেঁছি নেকড়ে হাসানকে বলল:

'এত কষ্ট করেছ আর ঝুঁকি নিয়ে হলুদ রংয়ের ঘোড়াটা নিয়ে এসেছ তুমি! ওটা তোমারই পাওয়া উচিত! একটু চোখ বন্ধ কর ত' দেখি!'

হাসান চোখ বন্ধ করল, আর যখন চোখ মেলল তখন দেখল নেকড়ের জায়গায় ঠিক হুবহু আর একটা হলুদ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

'আমাকে নিয়ে যাও বাদশাহের কাছে', বলল নেকড়ে, 'তার কাছে আমার বদলে নেবে মহামূল্য শালসমেত সুন্দরী মেয়েকে। তাকে নিয়ে এখানে এসে হলুদ ঘোড়ায় বসে যাবে পাখীর মালিকের কাছে! আমি মাঝপথেই তোমার নাগগাল ধরব!'

বাদশাহকে নেকড়েটা দিয়ে তার বদলে শাল আর মহামূল্যবান উপহারসমেত শাহজাদীকে নিয়ে হলুদ ঘোড়ায় চড়ে পাখী আনতে চলল।

বদল করা ঘোড়াটা ওদিকে একঘণ্টা বাদেই নেকড়েতে পরিণত হয়ে পালাল আস্তাবল থেকে। হাসান আর সুন্দরীকে সে মাঝপথেই ধরে ফেলল। সবাই মিলে তারা চলল পাখীর মালিকের বাড়ীর দিকে।

নেকড়ে হাসানকে বলল:

'এমন সুন্দরীকে দিয়ে দিতে খারাপ লাগছে। ওকে দেব না আমরা, তুমি ওকে বিয়ে করবে! চোখ বন্ধ কর তো!'

হাসান খুলে দেখে যেন সুন্দরীকে তারা নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আর সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

'আমাকে নিয়ে যাও বাদশাহের কাছে', বলল নেকড়ে। 'তার কাছে দাঁড়সমেত পাখীটা নিয়ে এখানে আসবে হলুদ ঘোড়ায় চড়ে সুন্দরীকে নিয়ে ছুটবে সেদিকে যেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি এসে পেঁছিব।'

সুন্দরীতে পরিণত হওয়া নেকড়েকে হাসান দিল পাখীর মালিককে, পাখীর মালিক আদেশ দিল দাঁড়সমেত পাখীটা তাকে দিয়ে দিতে। নিজে এদিকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

হাসান হলুদ ঘোড়ায় চড়ে পাখীকে আর সুন্দরীকে নিয়ে অনেক দূরে। ওদিকে পাখীর মালিকের বিয়ের সময় সুন্দরী নেকড়েতে পরিণত হয়ে পালিয়ে গেল প্রাসাদ ছেড়ে। নেকড়ে শীগগিরিই হাসানের নাগাল ধরে ফেলল, তারপর একসঙ্গে তারা চলল হাসানের বাবার রাজ্যের উদ্দেশ্যে।

অমন আশ্চর্য পাখীটা এনে দেওয়ায় হাসানের বাবা ছেলের ওপর এমন খুশী হলেন যে তখুনি আদেশ দিলেন হাসানের আনা সুন্দরীর সঙ্গে তার বিয়ের উৎসবের আয়োজন করতে।

হাসানের বিয়েতে নেকড়েও উপস্থিত ছিল সম্মানিত অতিথি হিসাবে — সেই তো হাসানকে সাহায্য করেছিল শাহজাদী, ঘোড়া আর পাখী পেতে।

পণ্ডিতরা পাখীর পালকের ওপরের লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার করলেন, তাতে লেখা ছিল মানুষের সব গুণগুলির কথা।

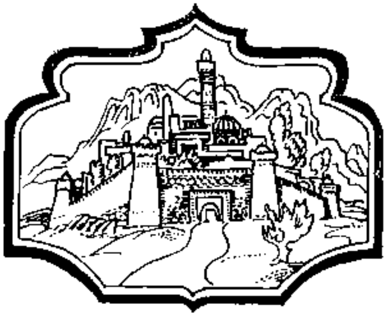

জেলের ছেলে ও গুলদোর মাছ

এক ছিল জেলে। একদিন সে নদীতীরে এসে ছিপ ফেলে একটা মাছ ধরল। মাছটা কিন্তু যে সে মাছ নয়—সে হল গুলদোর, সারা শরীর লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত ফুলে ঢাকা; পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই। খুশী হয়ে জেলে বঁড়শী থেকে মাছটা খুলে নিয়ে দেখতে লাগল সে তাকে মুগ্ধ হয়ে, হঠাৎ মাছটা তার হাত ফসকে পালিয়ে গেল জলের মধ্যে।

সেই থেকে জেলের মন থেকে সুখ আনন্দ বিদায় নিল। বাড়ী ছেড়ে চলে গেল সে নদীর ধারে, সেখানেই একটা কুটীর তৈরী করে থাকতে লাগল; সারাদিনরাত নদীতে ছিপ ফেলে বসে থাকে। কিন্তু গুলদোর মাছ আর পড়ে না তার ছিপে কিছুতেই। তেমনি করে নদীর ধারেই একদিন মরে গেল জেলে।

সেই জেলের এক ছোট ছেলে ছিল। সে যখন বড় হল মাকে বলল:

'এবার একটা কোন কাজে লাগা উচিত আমার। আমার বাবা কি কাজ করতেন বল মা, আমিও সেই কাজই করব।'

'বাছা রে, তোর বাবা কি করতেন সে কথা জানতে চাস না।' মা উত্তর দিল।

কিন্তু ছেলেটির ভীষণ আগ্রহ হল জানার জন্য। তখন তার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'যদি তুই জানতে চাস কি কারণে তোর বাবার মৃত্যু হয়েছে তো ঘরের ছাদের দিকে দেখ।'

ছাদের দিকে তাকিয়ে ছেলে বাবার ছিপগুলো দেখতে পেল।

'আমার বাবা মাছ ধরতেন!' উৎসাহিত হয়ে বলল ছেলে। 'আমিও তাহলে মাছ ধরার কাজ করব!'

ছাদের থেকে ছিপগুলো পেড়ে আনল, বঁড়শীর জং পরিষ্কার করল, তেল মাখাল। সকালবেলায় মাকে বলল: 'আমার সঙ্গে নেবার জন্য রুটি তৈরী করে দাও, মাছ ধরতে যাব।'

'নদীতে যাস না রে বাছা!' বারবার বোঝাতে লাগল তার মা কিন্তু কোন কাজ হল না তাতে; খাবার তৈরী করে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে বলল: 'তাড়াতাড়ি করে ফিরে আসিস!'

জেলের ছেলে নদীতীরে এসে জলে ছিপ ফেলল। ছিপে টান দিয়ে তুলল একটা মাছ।

যে সে মাছ নয় সেটা — গুলদোর, সারাশরীর ফুলে ঢাকা; তার আঁশগুলো রোদের আলোয় ঝলক দিচ্ছে; পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই।

জেলের ছেলে মাছটাকে নিয়ে একটা ভেজা রুমালে জড়িয়ে ছুট দিল বাড়ীর দিকে।

'মা গো, দেখ কি পেয়েছি আমি!' চীৎকার করে বলল সে। দেখ শীগগির — এ হল গুলদোর মাছ!'

সে কথা শুনে অবাক হল মা, কিন্তু যখন গুলদোর মাছ দেখল তখন তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল।

'না, এমন মাছকে রান্না করব না, চল ওকে আমাদের চৌবাচ্চায় ভাসিয়ে দিই।' বলল মা।

চৌবাচ্চায় গুলদোর মাছটাকে ছেড়ে তারা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল কেমন আপাদমস্তক ফুলে ঢাকা মাছটা সাঁতার কাটছে।

প্রতিবেশীদের ডেকেও দেখাল তারা মাছটা। সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখল সবাই মাছটা যতক্ষণে না সূর্য নামল আর গুলদোর জলের নীচে চলে গেল ঘুমোবার জন্য।

ভোরের আলো সবে ফোটামাত্র ফটকে কে যেন ধাক্কা দিল। জেলের ছেলে ফটক খুলে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাদশাহের কয়েকজন চর।

'হুজুর জেনেছেন যে তুই ধরেছিস গুলদোর মাছ, যার চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই পৃথিবীতে।' বলল চররা। হুজুরের আদেশ যেন তুই অবিলম্বে গুলদোরকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসিস।'

করার কিছু নেই: জেলের ছেলে একটা জলভরা পাত্রে মাছটাকে নিয়ে তার ওপর একটা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে নিয়ে চলল প্রাসাদে।

বাদশাহ আদেশ দিল গুলদোর মাছটাকে প্রাসাদের জলাধারে ছেড়ে দিতে। জলাধারের পরিষ্কার জলে মাছটার আঁশের ওপরের ফুলগুলো সূর্যালোকে ঝকঝক করতে লাগল। মাছটার দিকে তাকিয়ে আনন্দ আর গর্ব নিয়ে বাদশাহ বলতে লাগল:

'পৃথিবীতে কারো এমন মাছ নেই। পৃথিবীতে আমার গুলদোর মাছের মত এমন সুন্দর আর কিছুই নেই!'

বাদশাহ আদেশ দিল মাছের জন্য নানা রংয়ের চামড়া দিয়ে একটা সুন্দর আটকোনা জলাধার তৈরী করতে, যাতে সেটাতে করে মাছটাকে যে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

চমৎকার চামড়ার জলাধারটায় মাছটা আরও সুন্দর দেখাতে লাগল, বাদশাহের আদেশে দাসরা মাছটাকে সর্বত্র নিয়ে যায় বাদশাহের সঙ্গে সঙ্গে।

একদিন দূর দেশের এক অতিথি এল বাদশাহের কাছে। তাকে গুলদোরকে দেখিয়ে বাদশাহ বলল:

'গোটা দুনিয়ায় আমার গুলদোর মাছের চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই!' আর কি চাই আমার ?'

'বাদশাহ, আর ও সুখী হোন !' বলল অতিথি। 'চামড়ার জলাধারে এমন চমৎকার মাছ আর কারো নেই। কিন্তু দূর দেশের বাদশাহের মেয়ে নার্গিস গুলদোর মাছের চেয়েও সুন্দর। শাহজাদী নার্গিসকে যদি কানে সোনার দুল পরিয়ে এখানে বসিয়ে রাখা যায় তবেই আর কিছু চাইবার থাকবে না আপনার।'

রেগে গেল বাদশাহ। উজীর, পারিষদদের ডেকে তখনি বলল তারা যেন অবিলম্বে তার জন্য এনে দেয় সোনার দুলপরা শাহজাদী নার্গিসকে।

কিন্তু উজীর — পারিষদরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে, কেউই জানে না কোথায় পাওয়া যাবে শাহজাদী নার্গিসকে। তখন তাদের মনে পড়ল জেলের ছেলের কথা যে গুলদোর মাছটা ধরেছিল:

'সেই সোনার দুলপরা শাহজাদীকে এনে দিতে পারে। মাছটা তো ও-ই ধরেছিল।'

জেলের ছেলেকে ডেকে আনা হল বাদশাহের কাছে। বাদশাহ তাকে আদেশ দিল অবিলম্বে নিয়ে আসতে শাহজাদী নার্গিসকে যে নাকি গুলদোরের চেয়ে সুন্দর।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন।' রাগে চীৎকার করে বলল বাদশাহ। 'যা এখুনি! না হলে তোর মাথা কেটে ফেলার হুকুম দেব।'

করার কিছু নেই। মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি পথে বেরোল সুন্দরী শাহজাদী নার্গিসের খোঁজে।

চলছে তো চলছেই। পথে দেখে একটা পুরান জুতো পড়ে আছে, সেটাকে পা দিয়ে মেরে ফেলে দিল দূরে ছুঁড়ে। হঠাৎ জুতোটার তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা বড় পিঁপড়ে, মানুষের গলায় বলল:

'ধন্যবাদ তোমায়, যুবক, তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। জুতোটার চাপে মরেই যাচ্ছিলাম প্রায়। এই নাও তোমাকে দিলাম আমার একটা শুঁড়। কষ্টে পড় যদি কোনদিন তো এটাকে জ্বালাবে তাহলেই আমি এসে পড়ে সাহায্য করব।'

পিঁপড়েকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছেলেটি শুঁড়তে বেঁধে রাখল কোমরবন্ধের সঙ্গে।

কয়েকদিন বাদে জেলের ছেলে এসে পেঁছাল একটা চওড়া নদীর ধারে। নদীর ওপারে এক পা আর এপারে এক পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্য।

সে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিকে:

'কোথা হতে আসছ, পথিক ?'

'আমি আসছি সেই দেশ থেকে যেখানে অর্ধেক দিন সূর্য থাকে।'

'যে যুবক গুলদোর মাছ ধরেছে তাকে তুমি জান নাকি?' জিজ্ঞাসা করল দৈত্য।

'আমিই সেই জেলে।' বলল যুবক।

'তোর অপেক্ষায় তো আছি এতদিন।' খুশীতে ফেটে পড়ল দৈত্য। 'এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি অনেক বছর, আদেশ পেয়েছি যে আমি নদীর ওপর থেকে নামতে পারি কেবল তখনই যখন আমার কাছে আসবে সেই জেলে যে গুলদের মাছ ধরেছে। এবার আমি মুক্তি পেলাম। তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'যাচ্ছি সোনার দুলপরা শাহজাদী নার্গিসকে খুঁজতে।' বলল জেলে। 'নদী পার হতে সাহায্য কর না আমায়?

দৈত্যটা নদীর ওপর ঝুঁকে পড়ে জল খেতে লাগল। একটু পরেই নদীতলে আর এক ফোঁটা জলও রইল না, তখন জেলে নদী পার হয়ে গেল। দৈত্য আবার নদীর জল ছেড়ে দিল নদীতে, তারপর সেও চলল জেলের সঙ্গে।

চলতে চলতে তারা এসে পৌঁছল একটা ছোট পাহাড়ের নীচে। সেখানে এক বিশালদেহী লোক কোদাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোদালের এক আঘাতেই পাহাড়ের আধখানা তুলে নিচ্ছে সে, তারপর আবার ফেলে দিচ্ছে। জেলে আর দৈত্য লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন জানাল।

'কোথা হতে আসছ তোমরা আর যাচ্ছই বা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল কোদালহাতে লোকটি।

'আমি আসছি সেই দেশ হতে যেখানে অর্ধেকদিন সূর্য থাকে, যাচ্ছি সোনার দুলপরা শাহজাদী নার্গিসকে খুঁজতে।' বলল জেলের ছেলে।

'তুমি যদি সেই দেশের লোক হও যে, যুবক গুলদোর মাছকে ধরেছে তাকে তুমি জান নাকি?' জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

'আমিই সেই যুবক।' বলল জেলের ছেলে।

'এলে তুমি শেষ পর্যন্ত।' খুশীতে চীৎকার করে উঠল বিশালদেহী লোকটি। 'কতদিন অপেক্ষা করেছি তোমার। পথ চেয়ে থেকে চোখগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বহুবছর ধরে এই পাহাড়টা একবার ভেঙে ফেলি, একবার গড়ি। আমার ভাগ্য আছে যে আমি এমনি করে যেতে থাকব যতদিনে না গুলদোর মাছ যে ধরেছে সেই জেলে এখানে আসবে। এবার আমি কোদাল কাঁধে ফেলে চলব তোমাদের সঙ্গে।'

এমন একজন শক্তিশালি সঙ্গী পেয়ে খুশী হল জেলের ছেলে, তিনজনে একসঙ্গে চলতে লাগল।

চলছে তো চলছেই তারা, কয়েকদিন বাদে দূরে দেখা গেল একটা উঁচু মিনার।

'ঐ দেখ জেলে, কোথায় তোমার যাওয়া দরকার। ঐ হল বাদশাহের শহর।'

আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে তারা দেখল যে মিনারের চূড়া গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে

আকাশে। মিনারের গায়ে বসান নানা রংয়ের পাথরগুলো ঝকঝক করছে। মিনারের ওপরে ঢাকী দাঁড়িয়ে আছে ঢাক নিয়ে। আর নীচে কোমরে তরোয়াল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

প্রবীন প্রহরীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জেলের ছেলে সসম্মানে তাকে অভিবাদন জানাল। প্রহরীটি জিজ্ঞাসা করল:

'কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, কি চাই তোমার ?'

'আমি এসেছি সেই দেশ থেকে যেখানে অর্ধেকদিন সূর্য থাকে, সোনার দুলপরা শাহজাদীকে নিতে এসেছি।' বলল জেলের ছেলে।

'তোমার মত অনেক বাহাদুর ছেলেই এসেছে শাহজাদীকে পাবার জন্য, কিন্তু ফিরে গেছে সবাই শূধু হাতে।' বলল প্রহরী।

'আমার একান্ত অনুরোধ, বলুন কেমন করে বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা করা যায় ?' বলল জেলের ছেলে।

'আমি এখন ফটক খুলে দেব। সেখানে দেয়ালে তুমি দেখতে পাবে বাদশাহ্‌র মোহর ছাপ দেওয়া ঘোষণা। তাতে আছে তিনটি শর্ত যা শাহজাদীকে পেতে গেলে পূরণ করতে হবে। পড়ে ভেবে দেখ: তুমি তা পূরণ করতে পারবে কিনা। তারপর মিনারের উপরে উঠে গিয়ে তিনবার ঘা দেবে ঢাকে, তারপর অপেক্ষা করবে।'

জেলের ছেলে সে ঘোষণা পড়ল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গিয়ে ঢাকে এমন জোরে বাড়ি মারল যে ঢাক টুকরা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। ঢাকার কানফাটান আওয়াজ বাদশাহ্‌র ঘুম ভাঙিয়ে দিল যে ঢাক বাজিয়েছে তাকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাতে হুকুম দিল বাদশাহ।

'শোন গো ছেলে তুমি আমার শর্ত পড়ে ঘাবড়ে যাও নি দেখি, তাই জন্যই ঢাক বাজিয়েছ!' বলল বাদশাহ জেলেকে। 'হাজার হাজার সাহসী বীর চেষ্টা করেছে আমার শর্ত পূরণ করতে, কিন্তু পারে নি। তেমার বয়স অল্প — পরামর্শ দিই এ প্রচেষ্টা না করতে।'

'যা হবার হোক!' বলল জেলের ছেলে। 'সোনার দুলপরা শাহজাদীকে পেতে হবেই আমায়।'

'আমার শর্তগুলো পূরণ করা কত দুরূহ, তা তুমি বুঝেছ কি ?' বলল বাদশাহ। 'ভেবে দেখ: সারারাত তোমায় কাটাতে হবে গরমে লাল হয়ে ওঠা আমার স্নানঘরে — এই হল প্রথম শর্ত। আমার সবচেয়ে দ্রুতগামী উটকে দৌড়ে হারাতে হবে তোমায় — এই হল দ্বিতীয়। আর বিভিন্ন দানার মিশান এক গাদা থেকে বেছে বেছে সব দানা আলাদা আলাদা করতে হবে এক রাতের মধ্যে — এই হল তৃতীয় শর্ত।'

'সব বুঝেছি।' বলল জেলের ছেলে। 'আমার কেবল একটাই অনুরোধ।'

'বল।'

'আমার সঙ্গে আছে দুই বন্ধু, ওরা আমার সঙ্গে থাকতে পারে ?'

'তোর সঙ্গে যেই থাকুক না কেন তাতে কোন আপত্তি নেই আমার। শর্ত পূরণ হলেই হল কেবল।' বলল বাদশাহ।

জেলে আর তার বন্ধুদের লাল করে গরম করা তামার স্নানঘরে নিয়ে যেতে বলল বাদশাহ। সে গরম তাপ সহ্য করতে না পেরে জেলের ছেলে চেঁচিয়ে উঠল:

'পুড়ে গেলাম রে !'

কিন্তু দৈত্য আগে থেকেই জল গিলে ধরে রেখেছিল। সে এবার ঢেলে দিল সেই জল স্নানঘরের মধ্যে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল স্নানঘর।

রাত কাটল। ভোরবেলায় বাদশাহ্‌র দাসরা এসে স্নানঘরের দরজা খুলে অবাক: জেলের ছেলে আর দুই বন্ধু জীবিত-অক্ষত।

শীঘ্রই সারা দেশের লোক জানল যে জেলে বাদশাহ্‌র প্রথম শর্ত পূরণ করেছে।

পরের দিন বাদশাহ সবচেয়ে দ্রুতগামী উটের পিঠে একটা দাসকে বসতে বলে তার হাতে একটা মশক দিতে বলল জল আনার জন্য। আরও একটা মশক জেলেকে দিয়ে বলল:

'এখানে থেকে নদী দু'ক্রোশ পথ। তোমাকে গিয়ে নদী থেকে জল নিয়ে উটের আগেই ফিরে আসতে হবে।'

বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতে উটের পিঠের লোকটি আর পায়ে হাঁটা জেলে একসঙ্গে যাত্রা আরম্ভ করল। কোদালধারী লোকটিও চলল জেলের সঙ্গে। যেই শহর ছেড়ে এল তারা অমনি কোদালধারী কোদালের দু'ঘায়েই উটের সামনে এক উঁচু পাহাড় তৈরী করে ফেলল।

যতক্ষণে উট অতি কষ্টে পাহাড়ের উপরে উঠে এপারে এসে নামল ততক্ষণে ওদিকে জেলে নদী পর্যন্ত ছুটে গিয়ে মশকে জল ভরে নিয়েছে। যখন সে ফিরে এল কোদালধারী চটপট পাহাড়টা ভেঙে সমান করে দিল। জেলে উটের কয়েক ঘণ্টা আগে ফিরে এল জল নিয়ে।

আবার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সে চালাকচতুর জেলে-বীর বাদশাহ্‌র দ্বিতীয় শর্তও পূরণ করেছে।

তৃতীয় দিনে বাদশাহ আদেশ দিল গম, যব, ভুট্টা আর জইয়ের দানা মিশিয়ে দিতে আর জেলেকে বলল:

'আজ রাতে, রাত ভোর হবার আগে পর্যন্ত এই দানাগুলো বেছে আলাদা আলাদা করে রাখবি ভাগে ভাগে। একটা দানাও যেন অন্য দানায় মিশে না থাকে, দেখিস !'

'এ কাজ কেবল পিঁপড়ের ভাক্কেই করা সম্ভব !' বলতে লাগল লোকে।

সে কথা শুনে জেলের ছেলের মনে পড়ল সেই পিঁপড়ের কথা, যেটাকে সে জুতোর তলা থেকে উদ্ধার করেছিল।

যখন রাত নামল, সবাই চলে গেল তখন ছেলেটি কোমর বেধে লুকান পিঁপড়ের শুঁড়টা বার করে জ্বালাল। সেই মুহূর্তে তার কাছে মাটিতে একটা ফাট ধরল আর তার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল হাজার হাজার পিঁপড়ে। তাড়াতাড়ি তারা আরম্ভ করে দিল দানা বাছার কাজ।

সকালবেলায় উজীরদের নিয়ে জেলের কাছে গিয়ে বাদশাহ অবাক যে তার তৃতীয় শর্তটাও ছেলেটি পূরণ করেছে।

সে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, আনন্দ হল জনগণের সে কথা শুনে যে জেলে তিনটি শর্তই পূরণ করতে পেরেছে।

তখন বাদশাহ আদেশ দিল জেলের ছেলেকে ভালো পোশাক-আশাক পরাতে আর বিয়ের আয়োজন করতে।

'হুজুর! আমি গরীব মানুষ, নিজের উপযুক্ত সঙ্গিনী বেছে নেব আমি। আর সোনার দুলপরা শাহজাদী চাই আমার দেশের বাদশাহ্‌র জন্য।'

রাজী হল বাদশাহ যে দেশে অর্ধেকদিন সূর্য থাকে সে দেশের বাদশাহ্‌র সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে।

সোনার দুলপরা শাহজাদীকে নিয়ে জেলে আর তার দুই বন্ধু ফেরার পথ ধরল।

চলতে চলতে তারা পেঁছাল একটা পাহাড়ের কাছে। কোদালধারী কোদাল দিয়ে দুয়েকবার ঘা দিতেই পাহাড় উধাও: সমান পথ তাদের সামনে।

'এবার, বন্ধু, বিদায় তাহলে। আমি আমার নিজের দেশেই থাকব।' বলল কোদালধারী জেলেকে। 'তোমায় সাহায্য করত পেরে খুশী আমি। ভাল থেকো আর আমাকে ভূলো না।'

মন খারাপ হয়ে গেল ছেলেটির — অমন ভাল ভাল বন্ধুকে ছেড়ে যেতে মন চায় না, কিন্তু তার কথার প্রতিবাদ করতে চাইল না।

কয়েকদিন বাদে জেলের ছেলে দলবল নিয়ে এসে পেঁছল গভীর চওড়া নদীর কাছে। দৈত্যটা তখন নদীর এপারে এক পা আর ওপারে অন্য পা রেখে নদীর ওপর ঝুঁকে পড়ে জল খেতে লাগল। একটু পরেই নদী গর্ভে আর এক ফোঁটা জলও রইল না। জেলে তার দলবল নিয়ে পার হয়ে গেল নদী। তখন দৈত্যটা নদীতে জল ছেড়ে দিল আবার আর বলল:

'তোমার সঙ্গে আর যাব না আমি, নিজের দেশেই থেকে যাব। তোমার কাজে লাগতে পারায় খুশী আমি। সুখী হও আর আমাকে ভুলো না।'

এ বন্ধুকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না জেলের ছেলের।

শেষে জেলের ছেলে দলবলসমেত নিজের দেশে পেঁছাল।

বাদশাহ সুন্দরী নার্গিসকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য এক বিরাট সমারোহের আয়োজন করল আর তখনই ঘোষণা করল যে সোনার দুলপরা শাহজাদীকে বিয় করবে সে। দারুণ জাঁকজমক করে বিয়ের উৎসব করা হল।

পরের দিন বাদশাহ সোনার দুলপরা শাহজাদীকে নিজের পাশে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে উজীরদের জিজ্ঞাসা করল:

'এবার তো আর কিছুই চাইবার নেই আমার, নাকি বলেন আপনারা ?'

'আর কিছুই চাইবার নেই আপনার, সোনার দুলপরা এমন শাহজাদী পৃথিবীতে আর

'আর কিছুই চাইবার নেই আপনার, সোনার দুলপরা এমন শাহজাদী পৃথিবীতে আর কারোই নেই।' বলল উজীররা।

তার পরের দিন সবেতে বিরক্তি ধরে গেল শাহজাদী নার্গিসের। সে কাঁদতে লাগল, চেঁচাতে আর পা ঠুকতে লাগল আর বাদশাহকে তাড়িয়ে দিল নিজের মহল থেকে।

শাহজাদীকে খুশী করার জন্য বাদশাহ আদেশ দিল চামড়ার তৈরী জলাধারে আপাদমস্তক ফুলে ঢাকা গুলদোর মাছকে নিয়ে আসতে, যার মত সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

কিন্তু শাহজাদী আরো জোরে চেঁচিয়ে, কেঁদে পা ঠুকতে লাগল, গুলদোর মাছটাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

সেখানে মাছটাকে দেখতে পেল জেলের ছেলে, তুলে নিল সে গুলদোরকে রুমালে মুড়ে, নিয়ে চলল নদীর দিকে।

'বাদশাহ আর শাহজাদী নার্গিসের মন ভোলানর চাইতে নদীর গভীরে খেলে বেড়ানই ভাল তোমার পক্ষে', বলে তাকে স্রোতস্বিনী নদীতে ছেড়ে দিল জেলের ছেলে।

জাদুকরের দান

এক ছিল বুড়ো আর তার এক বুড়ী। তাদের এক ছেলে ছিল, নাম তার কাম্বার। খুবই কষ্টে দিন কাটে তাদের।

বুড়ী একদিন সুতো কেটে ছেলেকে বলল:

'তুই বড় হয়েছিস, বাপ, এবার আমাদের সাহায্য কর। বাজারে যা, সুতো বেচে রুটি কিনবি।'

বাজারে গেল ছেলেটা, সুতো বেচল, রুটি কিনতে যাবে, এমনসময় দেখে একটা কুকুর দৌড়চ্ছে আর ছেলের দল তাড়া করছে তাকে, মেরে ফেলতে চাচ্ছে তারা কুকুরটাকে।

'মেরো না কুকুরটাকে, ওটা দিয়ে দাও আমায় !' বলল কাম্বার ছেলেদের।

'এর জন্য দাম দাও, তাহলেই পাবে ওটাকে।' বলল ছেলেরা।

সুতো বেচে পাওয়া পয়সাগুলো ছেলেদের দিয়ে দিল কাম্বার আর কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল।

'কি কিনলি ?' জিজ্ঞাসা করল তার মা।

'কুকুর কিনলাম। ছেলেগুলো একে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, মায়া হল আমার, তাই কিনে নিলাম ওটাকে।'

'ওরে আকাট, মুখ্যু। ঘরে রুটি নেই আমাদের আর তুই শেষ কাণাকড়িটাও দিয়ে দিলি কুকুরটার জন্য।' হাহুতাশ করতে লাগল তার মা।

কয়েকদিন বাদে বুড়ী আবার ছেলেকে পাঠাল সুতো বেচে রুটি কেনার জন্য।

সুতো বেচে রুটি কিনতে যাবে কাম্বার এমন সময় দেখে ছেলেরা একটা সাপ ধরেছে, মেরে ফেলতে চাইছে সেটাকে।

'মেরো না ওটাকে, আমায় দিয়ে দাও!' বলল কম্বার।

'ওটার দাম দাও, তাহলেই নিতে পার।' বলল ছেলেরা।

কাম্বার সুতো বেচে পাওয়া পয়সাগুলো দিয়ে দিল ছেলেদের আর সাপটাকে পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে চলল বাড়ী।

'কি আনলি?' জিজ্ঞাসা করল তার মা।

'সাপ একটা। ছেলেগুলো এটাকে মেরে ফেলছিল, আমার মায়া হল ওটার জন্য, তাই কিনে নিলাম।'

'ওরে অপদার্থ! আমরা মরি খিদের জ্বালায় আর ও এদিকে শুধু শুধু পয়সা খরচ করছে। দূর হয়ে যা তুই তোর সাপটা নিয়ে!'

কাম্বার মনের দুঃখে চলল যেদিকে দুচোখ যায়।

চলতে চলতে এল এক মরুভূমিতে। সেখানে না আছে ঘাস, না ঘাছপালা, না জল। কাম্বার খিদেতেষ্টা আর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল। খাবার নেই কিছুই, কাঁদতে আরম্ভ করল সে। হঠাৎ তার পোশাকের ভিতর নড়েচড়ে উঠল সাপটা আর বলল:

'কাঁদিস না, কাম্বার, পিছনে চেয়ে দেখ।'

কাম্বার পিছন ফিরে দেখে এক বিরাট প্রাচীর উঠেছে।

'ঢুকে যা ফটকের মধ্য দিয়ে!' বলল সাপটা। 'এখানে থাকেন আমার বাবা — জ্ঞানী সাপ-জাদুকর।'

সাপের বাবা ছেলেকে ফিরে পেয়ে এত খুশী হল যে দাসদের হুকুম দিল শিঙা, ঢাক বাজাতে আর সাপের রাজ্যের সবাইকে আহবান জানাতে ভোজে।

'ছেলেরা আমায় ধরে মেরে ফেলছিল। কাম্বার আমাকে কিনে নিয়ে আমার জীবন বাঁচায়।' বলল সাপ তার বাবাকে।

'তোর এই উপকারের পরিবর্তে তুই আমার কাছে থাকতে পারিস যতদিন চাস!' বলল কাম্বারকে সাপের বাবা আর দাসদের নির্দেশ দিল ছেলেটি যা চাই তাই তাকে দিতে।

কিন্তু সাপেদের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে হল না কাম্বারের।

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস বলে বাবা তোকে পুরস্কার দিতে চাইবে।' সাপটা বলল তাকে। 'তুই তার কাছে উপহার হিসাবে জমি, শহর, মণিমুক্তা নিস না। তুই চাইবি যে পাত্র আপনা থেকে রান্না করে, যে চাদর পাতলেই খাবার ভরে ওঠে, সে গাধার মুখ থেকে সোনা বেরোয় আর সেই লাঠি, যেটা যাকে মারতে বলা হবে তাকেই মারবে।'

কাম্বার সাপের বাবার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল:

'এমন আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ, এবার আমাকে নিজের পথে চলতে দিন।'

'তোকে তো খালি হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।' বলল সাপের বাবা। 'তুই আমার একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়েছিস! কি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি তোকে? যা তুই চাস, তাই প্যাবি।'

'তাই যদি হয় তো আমাকে দিন সেই পাত্র, যাতে আপনা থেকেই রান্না হয়, সে চাদর বিছালে আপনা থেকেই খাবার এসে পড়ে, যে গাধার মুখ থেকে সোনা বেরোয় আর সেই লাঠি যে যাকে মারতে বলা হবে তাকেই মারবে।'

সাপ-জাদুকর কাম্বারকে দিল সেই জাদুর পাত্র, চাদর, গাধা আর লাঠিটা।

ছেলেটি গাধার পিঠে উঠল নিজে, আর থলিতে ভরে নিল পাত্র, চাদর আর লাঠিটা, ভ্রমণ করতে লাগল এমনিভাবে।

অনেক চলে, অনেক দেশ ঘুরে তার বাড়ীর জন্য মন কাঁদতে লাগল, বাড়ী ফিরবে ঠিক করল সে। রাত কাটাবার জন্য বরাবরই সে থেমেছে মাঠেবনে, একদিন হঠাৎ তার ইচ্ছা হল সরাইখানায় রাত কাটাতে। এক সরাইখানায় ঢুকে তার মালিককে ডেকে বলল তাকে সরাইখানার সবচেয়ে ভাল জায়গাটা দিতে।

'ভাল জায়গার দামও ভাল!' বিদ্রূপ করে বলল সরাইখানার মালিক।

'গাধা রে, সোনা বার কর!' বলল কাম্বার আর তখনই কাম্বারের হাতে চকচক করে উঠল কতকগুলো মোহর।

বিস্মিত মালিক বুকে হাত রেখে নীচু হয়ে সম্মান দেখিয়ে বলল:

'যাও, বাপ, নিজেই দেখে বেছে নাও পছন্দমত জায়গা।

কাম্বার মালিকের দিকে মোহরগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বেছে নিল সরাইয়ের সবচেয়ে পরিষ্কার জায়গাটা, গাধাটা বেঁধে রাখল বাইরে একটা থামের সঙ্গে। তারপর এসে বসল দেয়ালের কাছে পাতা কম্বলের ওপর।

'কি খেতে চাও, বাপ? পোলাও, কাবাব যা চাও এখুনি সব তৈরী হয়ে যাবে।' বলল সরাইখানার মালিক হাতের মুঠোয় মোহরগুলো চেপে ধরে।

'কিছু চাই না, আমার সব আছে।' বলে কাম্বার চাদরকে বলল বিছিয়ে যেতে, পাত্রটাকে বলল পোলাও বাঁধতে। 'বোস, খাও আমার সঙ্গে!' সরাইখানার মালিককে আমন্ত্রণ জানাল কাম্বার।

কেবল সরাইখানার মালিকই নয়, সরাইখানায় যারা এসেছিল রাত কাটাতে তারা সবাইও খেল চাদরে বিছান নানা রকম উপাদেয় খাবারদাবার।

পাত্রটায় অনবরত পোলাও রান্না হয়েই চলেছে সবাই খেল যত প্রাণ চায়, পেট ভরে খেয়ে শেষে ঘুমোতে গেল সবাই।

দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত কাম্বারও ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

ঘুমোল না কেবল সরাইখানার মালিক। কাম্বারের প্রতি হিংসায় জ্বলছে তার মন, তাই ঘুমোতে পারছে না সে। আস্তাবলে গিয়ে সে কাম্বারের গাধাটার বাঁধন খুলে দূরে একটা কোনায় লুকিয়ে রেখে দিয়ে তার জায়গায় থামে বেঁধে রেখে দিল নিজের একটা গাধাকে।

তারপর বদলে ফেল কাম্বারের চাদর আর পাত্রটাও।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে কাম্বার ঠিক করল দেরী না করে রওনা দেবে পথে।

গাধার পিঠে চড়ে বসল সে, বুঝতে পারল না যে সেটা তার গাধা নয়, চাদর, পাত্রও ভরে নিল থলিতে, হাতে নিল লাঠিটা, বেরিয়ে পড়ল সরাইখানা ছেড়ে।

পথে কাম্বারের খিদে পেল। একটা গাছের কাছে থেমে সে চাদরকে বলল বিছিয়ে যেতে আর পাত্রকে রান্না করতে। চাদর আর পাত্র কিন্তু কিছুই করল না।

'দেখি তো, গাধা, সোনা দে!' চীৎকার করে উঠল কাম্বার।

গাধারও মুখ দিয়ে সোনা বেরোল না।

বুঝল কাম্বার যে গাধা, চাদর আর পাত্রটা বদল করে নিয়েছে, তখনি সে ফিরে এল সরাইখানায়।

'ওহে, কর্তা, এখুনি আমার সব জিনিস দিয়ে দাও!' বলল কাম্বার।

'কি জিনিস? কি করে তুই ভাবলি যে আমি চুরি করেছি? চলে যা এখুনি, না হলে পিটিয়ে ধুনো করব তোকে!'

'দেখব, কে কাকে ধোনে!' বলে কাম্বার জামার ভিতর থেকে লাঠিটা নিয়ে বলল: 'মার ওকে!'

লাঠিটা সরাইখানার মালিককে মারতে আরম্ভ করল। সরাইখানার মালিক হাত আড়াল করে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খানিক বাদেই মারের চোটে আধমরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, ক্ষমা চাইতে লাগল সে।'

আমার চাদর, পাত্র আর গাধা ফিরিয়ে দিবি?' জিজ্ঞাসা করল কাম্বার।

'দেব, দেব কেবল থামা তোর লাঠি!' আধমরা হয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল সরাইখানার মালিক।

'হয়েছে, থাম্!' চীৎকার করল কাম্বার আর লাঠিটা চোরকে পিটান বন্ধ করল।

নিয়ে এল সরাইখানার মালিক পাত্রটা, চাদর আর গাধাটা কাম্বার থলিতে ভরল জিনিসগুলো, জামার নীচে লুকাল লাঠিটা, নিজের গাধায় চড়ে পথে নামল।

কয়েক দিন বাদেই কাম্বার এসে পেঁছাল নিজের শহরে। শহরের প্রান্তে থামল সে, তারপর দূর থেকে নিজের বাড়ীর ওপর চোখ রাখতে লাগল। সেখানেই তাকে দেখতে পেল সেই কুকুরটাকে যেটাকে সে একদিন কিনেছিল ছেলেদের কাছে।

কুকুরটা কাম্বারকে চিনতে পেরে তার কাছে ছুটে এসে তাকে আদর করতে লাগল।

যে রুমালটা মা তার কোমরে বেঁধে দিত সেটা খুলে নিয়ে কাম্বার কুকুরের গলায় বেঁধে দিল আর তাকে বাড়ীতে যেতে বলল।

বুড়োবুড়ী তো ওদিকে হারিয়ে যাওয়া ছেলের শোকে কাতর। এখন মা কুকুরের গলায় ছেলের কোমরে বাঁধার সেই নিজের হাতে সেলাইকরা রুমাল দেখে কেঁদে ফেলল, ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলল:

'এখানেই কোথাও আছে আমার ছেলে!'

সত্যিই বাড়ীর কাছেই নিজের কাম্বারকে দেখতে পেল।

সেদিকে ছুটে গিয়ে আনন্দে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল বাড়ীর মধ্যে।

'মা ঘরদোর উঠান পরিষ্কার করে ঝাঁট দাও, জাদুকরের উপহার বার করব এখন। সাপ-জাদুকর এগুলো আমাকে উপহার দিয়েছে তার ছেলে সেই ছোট সাপকে বাঁচিয়েছিলাম বলে।' বলল কাম্বার।

উঠোনে গাধাটাকে নিয়ে এসে বলল সোনা দিতে। বেচারী বুড়োবুড়ী তো নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

'দেখি তো, পাত্র, পোলাও রান্না কর আমাদের জন্য!' হুকুম দিল কাম্বার।

তখনি পাত্রটা গরম পোলাওকে ভরে উঠল।

'খুলে যাও চাদর, এনে দাও আমাদের জন্য ভাল ভাল খাবার!' বলল কাম্বার।

চাদরটা বিছিয়ে গেল আর তার ওপর এসে গেল বিভিন্ন ধরণের খাবারদাবার যা সব বুড়োবুড়ী জীবনেও দেখে নি।

এরপর জামার নীচ থেকে লাঠিটা বার করে কাম্বার বলল: 'এই লাঠিটা আমাদের রক্ষা করবে চোর আর অত্যাচারীর হাত থেকে।'

ছেলের ফিরে আসায় আনন্দ করতে লাগল বুড়োবুড়ী, এরপর তাদের আর অভাব বলে কিছু রইল না।

সোনার পাখী তিল্লোগিন

এক ছিল গরীবলোক। দুনিয়ায় তার আপন বলতে ছিল কেবল এক ছেলে। আর সম্পত্তি বলতে ছিল এক পাঁশুটে রংয়ের কুকুর আর একটি বেড়াল।

এক রাতে লোকটি তার ছেলেকে ডেকে বলল:

'আমার বয়স হল রে, বাবা, রুগ্ন আমি, মরব ক'দিন বাদেই। তোকে এবার জানাতে চাই একটা গোপন কথা। অনেক দিন আগে যখন আমার বয়স কম, উঠোনে একটা চৌবাচ্চা খুঁড়ছিলাম আমি। হঠাৎ আমার কোদালে ঠেকল শক্ত কি একটা। আরও খুঁড়তে লাগলাম, খুঁড়তে খুঁড়তে পেলাম একটা লোহার সিন্দুক। তালা বন্ধ করা সিন্দুকটা আর চাবিটা তার গায়েই লাগান ঝুলছে। চাবিটা খুলে নিলাম সিন্দুকটা আর খুললাম না, ভাবলাম জীবনে যখন খুব কঠিন দিন আসবে তখনই খুলব। জীবনে কত কঠিন দিন এসেছে, কিন্তু কখনও ছুঁই নি সিন্দুকটা। আজ বুড়ো হয়ে গেলাম। সে ধন ভোগ করলাম না। এবার আমি সে ধন তুলে দিতে চাই তোর হাতে।'

লোকটি নিজের বিছানার মাথার কাছে হাতড়ে হাতড়ে একটা চাবি পেল, দিল সেটা ছেলের হাতে।

ভোরবেলায় ছেলেটি কোদাল নিয়ে চৌবাচ্চায় মাটি খুঁড়তে লাগল। তার কুকুর আর বেড়ালও চলল তার সঙ্গে, নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে তারাও সাহায্য করতে লাগল মাটি খুঁড়তে।

খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে ছেলেটি পেল সিন্দুকটা, সিন্দুকের ঢাকার হাতলটা ধরে টান দিল, কিন্তু নড়াতে পারল না সেটাকে মোটে, যেন মাটিতে গেঁথে গেছে সেটা। তখন ছেলেটি সিন্দুকের ডালায় চাবি পুরিয়ে ঘোরাল।

সিন্দুকের ডালাটা তখুনি খুলে গেল সড়াৎ করে আর তার ভিতর থেকে মাথা তুলল একটা মস্ত বড় সাপ। ছেলেটি কোদাল তুলল সাপটাকে আঘাত করবে বলে, কুকুর আর বিড়ালও তাদের প্রভুকে বাঁচাবে বলে সাপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু সাপটা হিসহিস করে কথা বলে উঠল মানুষের গলায়:

'শোন যুবক। তুমি আমাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছ বলে আমি দামী উপহার দেব। সিন্দুকে তুমি পাবে একটা সোনার বাক্স, তাতে আছে একটা ছোট্ট সোনার পাখী তিল্লোগিন। পাখীটা নিয়ে তাকে সাত পরত তুলোয় মুড়ে লুকিয়ে রাখবে নিজের মাথার বালিশের নীচে। যখন তোমার কোন কিছু পেতে ইচ্ছে হবে, তখন পাখীটা নিয়ে হাতের ওপর রেখে তাকে বলবে যা চাও তুমি। পাখীটা পাখা ঝাপটা দেবে আর তখুনি তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।'

এ কথা বলে সাপটা সিন্দুক থেকে বেরিয়ে চলে গেল। ছেলেটি তখন সিন্দুকের ভিতরে দেখল, দেখে সত্যিই সেখানে রয়েছে একটা সোনার বাক্স। বাক্সটা খুলে তার ভিতরে পেল সোনার পাখী তিল্লোগিন। পাখীটা নিয়ে হাতের তেলোর ওপর রেখে বলল:

'আমার বাবা যেন সুস্থ হয়ে যান আর আমার বাড়ীটা নতুন হয়ে যাক!'

নড়েচড়ে উঠল সোনার পাখীটা, ডানা ঝাপটা দিল, তার সোনার পালকগুলের ঝলকে চোখ ঝলসে গেল।

ছেলেটি পোশাকের প্রান্তে পাখীটা ঢেকে নিয়ে ছুটল বাড়ীর দিকে।

তাদের পুরোন বাড়ীর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নতুন চমৎকার বাড়ী একটা আর বাবা বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুস্থ, হাসিখুশী।

পাখীটা আবার হাতের তেলোয় বসিয়ে ছেলেটি বলল:

'আমার কুকুরটা যেন বাতাসের মত দ্রুতগামী হয় আর বেড়ালের চোখ যেন এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি হয় যে যা কিছু লুকান থাকে সব যেন দেখতে পায়!'

নড়েচড়ে উঠল পাখীটা, পাখায় ঝাপটা দিল, সোনার পালকগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ছেলেটি তাড়াতাড়ি পাখীটাকে পোশাকের প্রান্তে ঢেকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে সাত পরত তুলো দিয়ে মুড়ে রাখল সেটাকে নিজের মাথার বালিশের নীচে। তারপর বাবাকে বলল:

'কুকুরের পিঠে বস, ও তোমাকে নিয়ে যাবে বাদশাহের প্রাসাদে। প্রাসাদে গিয়ে শাহজাদী সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব কর!'

'তোর মাথার গোলমাল হয় নি তো, বাছা? শাহজাদীকে বিয়ে করতে যাবি কেন রে তুই?' অবাক হয়ে বলল বাবা।

কিন্তু ছেলে জেদ করতে লাগল।

কি আর করে তার বাবা, কুকুরের পিঠে চড়ে এক মুহূর্তে পেঁৗছে গেল বাদশাহের প্রাসাদের সামনে।

ঘটকালি করার প্রথা অনুযায়ী ছেলেটির বাবা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঝাঁট দিতে লাগল প্রাসাদের সামনেটা।

তখনি বাদশাহ্‌র কাছে খবর গেল যে একজন গরীব লোক এসেছে তার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

'কি সাহস ?! এমনি স্পর্ধার জন্য ফাঁসি দেওয়া হোক ওর !' রেগে বলল বাদশাহ।

যখন প্রহরীরা লোকটিকে ধরে নিয়ে চলল সে চেঁচাতে লাগল:

'বাদশাহকে বল যে আমার ছেলে তাঁর মেয়ের জন্য ভাল পণ দেবে।'

প্রভুর বিপদ দেখে কুকুরটা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ল বাড়ীতে ছেলেটির কাছে।

ছেলেটি পাখীটা বার করে তুলোর মোড়ক খুলে হাতের তেলোর ওপর বসিয়ে বলল:

'বাবাকে এখনি বাড়ী ফিরিয়ে আন !'

পাখীটা নড়েচড়ে উঠল সোনার পালকের ঝলক ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে।

যখন জল্লাদরা ছেলেটির বাবার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে এমন সময় সে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে মুহূর্তে হাজির হল নিজের বাড়ীতে।

'দেখলি তো শাহজাদীর মেয়ের বিয়ের কথা তোলা কি ঝামেলা !' বলল বাবা।

'ভয় নেই, বাবা, কাল আবার যাবে ঘটকালি করতে।' বলল ছেলে।

পরের দিন আবার সেই লোকটাকেই প্রাসাদের কাছে দেখতে পেল বাদশাহ্‌র দাসরা।

'পুড়িয়ে মারা হোক তাকে !' আদেশ দিল বাদশাহ।

'বাদশাহকে বল আমার ছেলে শাহজাদীর জন্য বাদশাহ যা চান তাই দেবে।' চীৎকার করে বলল লোকটি, কিন্তু তার কথায় কান দিল না কেউ আর নিয়ে চলল তাকে পুড়িয়ে মারতে, কুকুরটা তখন আবার চীৎকার করে উঠে দৌড়ল বাড়ীর দিকে।

ওদিকে আগুন জ্বালান শুরু হয়েছে এমন সময় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি আর এক মুহূর্তেই এসে হাজির হল বাড়ীতে।

'ছাড় রে, বাপ, তুই ঐ শাহজাদীকে বিয়ে করার মতলব।' বলল বাবা।

'না, বাবা, ছাড়ব না।' বলল ছেলে। 'কাল তুমি যাবে, বাবা, তৃতীয়বার প্রস্তাব নিয়ে।'

যখন তৃতীয় দিনেও বাদশাহকে খবর দেওয়া হল যে সেই একই লোক আবার এসেছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, বাদশাহ চীৎকার করে উঠল:

'আরে এ কি লোক রে বাবা, যাকে মেরে ফেলাও যায় না ? নিয়ে এস ওকে আমার কাছে !'

বাদশাহকে কুর্ণিস করে ছেলেটির বুড়ো বাবা বলল:

'আমার ছেলে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, জাঁহাপনা, মেয়ের জন্য আপনি যে পণই চাইবেন তাই দেবে সে।'

'গরীব চাষীর ছেলে আবার আমার মেয়ের জন্য কি পণ দিতে পারে ?' বলল বাদশাহ গর্বিতভাবে।

বাদশাহ্‌র কানের কাছে উজীর বলল: 'জাঁহাপনা ওর কাছে এমন কিছু চান যা ও কখনও স্বপ্নেই ভাবে নি, তাহলেই এখানে আসতে আর সাহস করবে না।'

বাদশাহ বলল:

'তোমার ছেলে এক রাতের মধ্যে নদীর মাঝে একটা দ্বীপ করে দিক। সেই দ্বীপে তৈরী করুক একটা দুর্গ, আর দুর্গে সোনার প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে যেন থাকে একটা বাগান আর বাগানের সব গাছগুলো যেন সোনার হয়। বাগানের মাঝে যেন থাকে সোনার তৈরী এক জলাধার, আর তাতে যেন ভাসে সোনার মাছ। সেখানেই থাকবে আমার মেয়ে। আর আমার জন্য তোমার ছেলে নিয়ে আসুক এক কারাভান বোঝাই উপহারদ্রব্য।'

বুড়ো বাপ বাড়ীতে ফিরে বলল ছেলেকে:

'বাদশাহ তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু তার বদলে এমন পণ চেয়েছেন যা কেউ কখনও স্বপ্নেও দেখে নি।'

সকালবেলায় শহরবাসীরা ঘুম ভেঙে দেখে: নদীর মাঝে — দ্বীপ, দ্বীপে — একটা দুর্গ, দুর্গের মাঝে সোনার গম্বুজওয়ালা একটা চমৎকার প্রাসাদ।

বাদশাহকে খবর দেওয়া হল। বাদশাহ বেরিয়ে এল সেই চমৎকার প্রাসাদ দেখতে, বেরিয়েই দেখে সেই বুড়ো আর তার ছেলে এসেছে তার জন্য কারাভান বোঝাই উপহার নিয়ে।

'আপনার ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে।' বলল ছেলেটি বাদশাহকে। 'এবার আপনার মেয়েকে দিন আমার স্ত্রী হিসাবে।'

গরীবের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেই হল বাদশাহকে।

বিয়ের পরে শাহজাদী বাস করতে লাগল নদীর মাঝে দ্বীপে সোনার প্রাসাদে।

কিন্তু উজীর নিজের ছেলের সঙ্গে বাদশাহ্‌র মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিল তাই রাগ চেয়ে রাখল মনে গরীবের ছেলের ওপর। সে আন্দাজ করল যে কেউ একজন সাহায্য করে ছেলেটিকে, ঠিক করল যে করেই হোক জানতে হবে তার গোপন কথা।

শাহজাদীর এক বহুদিনের পুরোন দাসীকে ডেকে উজীর বলল: 'বাদশাহ্‌র জামাইকে কে সাহায্য করে জানার চেষ্টা কর, উপযুক্ত পুরস্কার পাবি তুই। আর যখন আমার ছেলে বাদশাহ্‌র জামাই হবে তখন প্রাসাদের সব দাসদাসীদের ওপর কর্ত্রী হবি তুই।'

একদিন বুড়ী শাহজাদীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল সেই চমৎকার প্রাসাদটা সম্পর্কে, সোনার গাছভরা বাগান, সোনার মাছভরা সোনার জলাধার সম্পর্কে।

'বল তো দেখি, এমন অদ্ভুত ক্ষমতা কোথা থেকে পায় তোমার স্বামী?' জিজ্ঞাসা করল বুড়ী।

'আমি নিজেও জানি না।' বলল শাহজাদী।

'এ আবার কেমন কথা নিজের স্বামীর সম্বন্ধেও এটুকু জান না! নাকি ও তোমায় বিশ্বাস করে না?' গজগজ করে বলে বুড়ী।

বদমাস বুড়ীর কথা শাহজাদীর মনে কৌতুহলের আগুন জ্বালিয়ে দিল।

সেইদিনই সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল কি করে সে এক রাতের মধ্যে প্রাসাদ আর দুর্গ তৈরী করল।

'কি হবে তোমার সে কথা জেনে? ও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না কখনও।' বলল স্বামী।

শাহজাদীর মুখ বেঁকে গেল। এমনকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিল।

স্বামী রেগে গিয়ে তার এই জেদের জন্য বকাবকি করতে লাগল। তখন শাহজাদী কেঁদে ফেলে বলল:

'তোমার গোপন কথা, আমি জানতে চাই।'

তার স্বামী ভাবল: 'ঠিকই তো স্ত্রীর কাছে কোন কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়।' সে নিজের বিছানার কাছে গিয়ে সোনার পাখীটা তুলে নিল। সেটি মোড়ক থেকে বার করে হাতের তেলোর ওপর রেখে বলল:

'মূল্যবান রত্নালংকার ভরা সম্পুট এনে দাও আমার স্ত্রীর জন্য।'

শাহজাদী চোখের জল মুছে উঠতে পারার আগেই সোনার পাখীটা ডানা ঝপটা দিয়ে উঠল, তার সোনার পালকের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে — আর মুহূর্তে তাদের সামনে এসে পড়ল প্রবাল মণিমুক্তার তৈরী রত্নালংকারে ভরা এক বাক্স।

'কি, এবার খুশী তো?' জিজ্ঞাসা করল স্বামী। তাড়াতাড়ি আবার পাখীটাকে সাত পরত তুলোয় মুড়ে নিজের মাথার বালিশের নীচে লুকিয়ে রাখল।

পরের দিন গরীবের ছেলে নিজের বিশ্বস্ত সহচর কুকুর আর বেড়ালকে নিয়ে শিকারে গেল। ওদিকে শাহজাদী সেই বুড়ীকে ডাকিয়ে দেমাক করে বলল যে স্বামীর গোপন কথা সে জানতে পেয়েছে। বুড়ী ঘাড় নাড়িয়ে বলল:

'তার মানে হল সব ক্ষমতা ঐ পাখীটার, আর নিজে সে এক সাধারণ প্রজা, শাহজাদীর ধারে ঘেঁষার উপযুক্ত নয় সে। উজীরের ছেলের বউ হলেই মানাত তোমায়।'

খল বুড়ীটা সোনার প্রাসাদে উজীরের ছেলেকে নিয়ে এল।

তাকে মনে ধরল শাহজাদীর। সে তখন সোনার পাখীটা নিয়ে হাতের ওপর রেখে বলল:

'দুর্গ, বাগান, সোনার প্রাসাদ সমেত এই গোটা দ্বীপটা নিয়ে যাও অনেক অনেক দূরে অন্য নদীতে — এখান থেকে যেখানে যেতে তিনবছর লাগে।'

নড়েচড়ে উঠল পাখীটা, পাখা ঝাপটা দিল, তার সোনার পালকের ঝলকে চোখ ধেঁধে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় গরীবের ছেলে শিকার থেকে ফিরে দেখে না প্রাসাদ, না দুর্গ, এমনকি নদীর সেই জায়গায় দ্বীপটাও নেই। মনে পড়ল তার যে আগের দিন সে তার গোপন কথা জানিয়েছিল স্ত্রীকে, বুঝল সবই।

তখন সে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের দ্রুতগামী কুকুরের পিঠে বসে বলল:

'চল জোরে সোনার প্রাসাদ আর দুর্গ খুঁজতে হবে।'

বাতাসের গতিতে ছুটল তার কুকুর।

কয়েক ঘণ্টা ছোটার পর গরীবের ছেলে দেখতে পেল সোনার গম্বুজের ঝলক, খানিক বাদে দেখা গেল নদীর মাঝে দ্বীপটাও।

দুর্গের সামনে নদীর পারে থেমে সে বেড়ালকে বলল:

'যা রে চটপটে, বেড়াল, এবার তোর ক্ষমতা দেখাবার পালা। কুকুরের পিঠে চড়ে দুর্গে যা। তুই বেড়াল দুর্গে ঢুকে সোনার পাখী তিল্লোগিনকে খুঁজে বার করবি। তারপর পাখীটাকে লুকিয়ে নিয়ে আমার অপেক্ষা করবি।'

মনিবের আদেশমতই কাজ করল কুকুর আর বেড়াল। তারপর গরীবের ছেলে দুর্গে ঢুকেই দেখতে পেল নিজের বাবাকে।

'এলি তুই শেষ পর্যন্ত!' খুশী হয়ে বলল তার বাবা। 'উজীবের ছেলে এখন এখানে কর্তা হয়ে বসেছে। সব দাসদাসীর ওপরওলা এক বদমাস বুড়ী আমাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

ছেলে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল সব ঘটনা।

ইতিমধ্যে বেড়ালও তাকে এনে দিয়েছে সোনার পাখী তিল্লোগিন।

'আমার বিশ্বাসী বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ!' বলে সে কুকুর আর বেড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল আর সোনার পাখীটাকে লুকিয়ে ফেলল পোশাকের নীচে।

'হ্যাঁরে, বাছা, তুই যে সোনার পাখীর কাছে চেয়ে নিয়েছিলি তোর কুকুরের দ্রুতগতি আর বেড়ালের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ঠিকই করেছিলি, তা নাহলে আর কোনদিনই দেখা হত না আমাদের।' বলল তার বাবা।

গরীবের ছেলে প্রাসাদে ঢুকে চীৎকার করে আদেশ দিল যেন শাহজাদী তখুনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায়।

যেই শাহজাদী উজীরের ছেলে আর বদমাস বুড়ীকে নিয়ে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গেল অমনি গরীবের ছেলে সোনার পাখীটা বার করে হাতের ওপর রেখে বলল:

'আমার দুর্গ, প্রাসাদ আর বাগান ফিরিয়ে নিয়ে যাও আমার দেশে।'

নড়েচড়ে উঠে পাখা ঝাপটা দিল পাখীটা, তার সোনার পালকগুলোর ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিল, আর সেই মুহূর্তে সোনার প্রাসাদ আর বাগানসমেত গোটা দুর্গটা পেঁছে গেল সেই দূর গ্রামে যেখানে আগে থাকত গরীবের ছেলে।

ওদিকে শাহজাদী, উজীরের ছেলে আর বুড়ী রয়ে গেল নদীর মাঝের শূন্য খাঁখাঁ সেই দ্বীপে তাদের কথা কেউ কখনও আর শোনে নি।

চারদিকে দূত পাঠাল বাদশাহ মেয়ের খোঁজে, দূতরা কিন্তু আর ফিরে আসে নি।

গরীবের ছেলে কিছুদিন বাদেই বিয়ে করল সেই গ্রামেরই এক গরীব মেয়েকে। দয়ামায়ায় ভরা মেয়েটির মন আর স্বামীর বাধ্য, পাখীটিকে যত্ন করে লুকিয়ে রাখে।

পালোয়ান আর সিমুর্গ পাখী

এক গ্রামে ছিল এক কামার। তার এক ছেলে ছিল — বিশালদেহী বীর, নাম খালিম।

ছোট বয়স থেকে এত বেশী খেত আর এত তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল যে কামার যত ভেড়াই জবাই করুক না কে কিছুতেই ছেলেকে পেটভরে খাওয়াতে পারে না।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দিনে তিনটি উটের মাংস খেলেও হয় না তার। তখন খালিম ঠিক করল ঘর ছেড়ে চলে যাবে সে শিকার করে নিজের আহার যোগাবে।

ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে খালিম বাবাকে অনুরোধ করল চল্লিশ মন ওজনের একটা লোহার শেকল তৈরী করে দিতে, সেই শেকলটা কাঁধে ঝুলিয়ে চলল যেদিকে দুচোখ যায়।

পথ চলতে থাকে সে, শিকার করে, খায়, ঘুমোয় আবার পথ চলে।

একদিন পথে তার দেখা হল সাদাকান নামে এক পালোয়ানের সঙ্গে। পালোয়ানটা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে এক হাতে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলছে একটা মস্ত বটগাছ। সাদাকানের সম্বন্ধে লোকে বলে যে সে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী লোক।

যখন সেই সর্বপরিচিত পালোয়ান দেখল তার চেয়েও লম্বা ঐ যুবক বীরকে কাঁধে চল্লিশমন ওজনের শেকল কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ইচ্ছে হল তার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করে দেখে।

যে জিতবে অন্যজন তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবে।

আরম্ভ হল লড়াই।

কিন্তু প্রখ্যাত পালোয়ান সাদাকান কামারের ছেলে যুবক বীর খালিমকে একটুকুও নড়াতে পারল না। হেরে গেল সে। আর হিংসায় তার মনে আগুন জ্বলল।

একসঙ্গে তারা দু'জনে পথ চলা আরম্ভ করল, অনেক পথ চলে শেষে তারা এসে পেঁছাল এক দূর দেশে।

সেখানে তারা অনেক শিকার করল, বুনো ছাগল মারল অনেক। মস্ত এক হাঁড়িতে করে রান্না চাপান, খেল দু'জনে আর বাকীটা রেখে দিল পরের দিনের জন্য।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে তারা দেখে হাঁড়ি ফাঁকা, কিছু নেই তাতে আর ছাগলের চামড়াগুলোও উধাও হয়ে গিয়েছে।

চোরকে খুঁজতে লাগল দুই পালোয়ান, কিন্তু কাউকে খুঁজে পেল না ধারেকাছে। আবার পথ চলতে চলতে তারা এসে পেঁছাল এক গভীর গিরিখাতের কাছে।

ঝুঁকে গিরিখাতের মধ্যে তারা দেখল যে কালকে তাদের মারা ছাগলগুলোর চামড়ার ওপর শুয়ে আছে এক ডাইন।

ঘুমোচ্ছে ডাইন, খালিম পালোয়ান একটুই না দেরী করে তার ওপরে ফেলে দিল নিজের চল্লিশমণ ওজনের শেকলটা, এক ঘায়েই মেরে ফেলল তাকে।

তখন তারা গিরিখাতে নেমে দেখে সেখানে এক চমৎকার বাগান। বাগানের সোনার বেড়ার ওপাশে অপূর্ব সব গাছ গজিয়েছে। সেই বাগানে থাকে অনেক সুন্দরী মেয়ে যারা ঐ ডাইনের হাতে বন্দী।

বাগানের সোনার ফটকের কাছে বসে ছিল এক বুড়ী। সে পালোয়ানদের বাগানে ঢুকতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু খালিম সোনার ফটক খুলে ভিতরে ঢুকে বন্দিনী সুন্দরীদের বলল যে ডাইনকে মেরে ফেলেছে সে, এখন মেয়েরা সবাই মুক্ত, যে সেখানে খুশী চলে যেতে পারে তারা।

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী যে তাকে মনে ধরল তার। মেয়েটিরও পছন্দ হল খালিমকে। সে রাজী হল তাকে বিয়ে করতে, চলল সেও তার সঙ্গে।

পালোয়ান সাদাকানের মন আবার জ্বলতে লাগল খালিমের প্রতি হিংসায়: তারও পছন্দ হয়েছে ঐ মেয়েটিকেই।

মেয়েটিকে একটা পালকের মত করে উঠিয়ে নিয়ে খালিম এগিয়ে চলল বাগান ছেড়ে।

যেখানে তারা নেমেছিল গিরিখাতে সেখানে এসে খালিম কাঁধের শেকলটা নিয়ে এক ঝটকা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। শেকলটা গিয়ে আটকে গেল গিরিখাতের উঁচু পাড়ের ওপর গজান একটা গাছে। উখন খালিম পালোয়ান প্রথমে সাদাকানকে সেই শেকল ধরে ধরে উঠে যেতে বলল, বলল সে যেন ওপরে উঠে শেকলটাকে গাছে আরও ভালো করে আটকে দেয়। সাদাকান ওপরে উঠে গেল, তারপর মেয়েটিকে ওপরে উঠতে সাহায্য করল। এবার খালিমের ওঠার পালা। কিন্তু হিংসুটে সাদাকান ঠিক করল তাকে মেরে ফেলবে। তাই ভারী শেকলটা ছুঁড়ে দিল একেবারে তার গায়ের ওপর।

খালিম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। এমনি ভাবে ধূর্ত সাদাকান বন্ধুকে প্রতারণা করে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

গিরিখাতের মধ্যে সে শুয়ে রইল অনেক দিন ধরে। এক দিন সকালে হঠাৎ তার ওপরের নীল আকাশটাকে ঢেকে ফেলল কালো মেঘ আর তার পায়ের কাছে এসে পড়ল কাঁচা ভেড়ার মাংস।

টাটকা মাংসটাকে পরম আগ্রহে খেয়ে নিল খালিম আর শরীরে একটু জোর পেল বলে মনে হল তার। প্রতিদিন সেই একই সময়ে আকাশটা ঢেকে যায় কালো মেঘে আর গিরিখাতের মধ্যে খালিমের পায়ের কাছে এসে পড়ে ভেড়ার মাংস।

শরীর ক্রমশ সেরে উঠতে লাগল খালিমের। শেষে একদিন উঠে দাঁড়াল সে।

আবার লোহার শেকলটা ওপরে ছুঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল সে।

হঠাৎ আবার একটা কালো মেঘ এসে ঢেকে ফেলল গোটা আকাশটা আর খালিম বুঝল যে শেকলটা আপনা থেকেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে শেকলটা, এক মুহূর্তেই ওপরে উঠে গেল সে।

ওপরে উঠে সে দেখতে পেল শেকলটা ধরে ছিল একটা মস্ত বড় পাখী তার ঠোঁটে। শেকলটা ছেড়ে দিয়ে পাখীটা উড়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। এত বড় পাখী এর আগে কখনও দেখে নি খালিম।

শেকলটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলল সে নিজের বাগদত্তাকে খুঁজতে।

সামনে পড়ল এক অজানা শহর। শহরে ঢুকে কান্নাকাটি শুনে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল যে শহরের লোক এক ভয়ংকর ড্রাগনের অত্যাচারে জর্জরিত। সেই ড্রাগনটা প্রতিদিনের খাবার একটা উট, একটা ভেড়া আর একটি মেয়ে যোগাতে হয় শহরবাসীদের। শহরের সব মেয়েকে খাওয়া হয়ে গেছে, বাকী আছে কেবল শাহজাদী, আজ রাতে তারই পালা মরার।

খালিম শহরের পথে চলতে চলতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ড্রাগনটার সম্বন্ধে। জানতে পারল যে ড্রাগনটা থাকে শহরের বাইরে এক নদীতে। সামনে কোন কিছু দেখলেই এমন জোরে নিঃশ্বাস টানবে সে যে সবকিছু ঝড়ের মত বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার মুখে।

অনেক সাহসী বীরই চেষ্টা করেছে শহরকে ঐ ড্রাগনের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু পারে নি, উল্টে নিজেরাই গিয়ে পড়েছে ড্রাগনের মুখে, — শহরবাসীরা বলল এমনি কথা।

সন্ধ্যাবেলায় খালিম গেল সেই নদীটার কাছে যেখানে ড্রাগন থাকে। মাঝরাতে সে বুঝতে পারল ড্রাগনটা তাকে কেমন টানছে নদীর দিকে, কিন্তু লোহার শেকলটার সাহায্যে সে তীর আঁকড়ে পড়ে রইল।

হঠাৎ ড্রাগনটা তীরে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ড্রাগনটা যখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে তখন খালিম শেকলটা ঘুরিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করল সেটাকে প্রচণ্ড জোরে।

ড্রাগনটা মরে পড়ে গেল মাটিতে। খালিম ড্রাগনটার পিঠের থেকে সরু লম্বা এক টুকরো চামড়া কেটে নিয়ে শহরে ফিরে গেল। শহরে বাদশাহের প্রাসাদের কাছে এসে চামড়ার টুকরোটা প্রাসাদের ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

সকালবেলায় বাদশাহ গেল সেই জায়গাটায় যেখানে তার মেয়ে মরেছে, কেঁদে মনটা একটু হালকা করার জন্য। কিন্তু মেয়েকে জীবিত-অক্ষত দেখে খুব আনন্দ হল তার।

বাদশাহ্‌র দাসরা নদীর কাছে ছুটে গিয়ে ফিরে এসে বলল ড্রাগনটা মরে পড়ে আছে আর তার পিঠ থেকে চওড়া ফিতের মত করে কেটে নেওয়া হয়েছে এক টুকরো চামড়া।

মেয়েকে নিয়ে শহরে ফিরে বাদশাহ দেখে প্রাসাদের ছাদের থেকে ঝুলছে ড্রাগনের পিঠের থেকে কেটে নেওয়া চামড়াটা।

'কিন্তু কে মারল ড্রাগনটাকে? কে সেই বীর?' জিজ্ঞাসা করল বাদশাহ।

কেউই জানে না এ প্রশ্নের উত্তর।

তখন বাদশাহ শহরময় ঘোষণা করতে আদেশ দিল:

'যে ছাদের থেকে ঐ চামড়ার টুকরোটা নামাতে পারবে তার হাতেই বাদশাহ তুলে দেবেন নিজের মেয়েকে।'

অনেক পালোয়ান এসে চামড়ার টুকরোটাকে ছাদ থেকে নামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটাকে একটুও নড়াতেও পারল না কেউ — এমন আর মোটা সেটা।

তখন খালিম এসে এক ঝটকায় টেনে সেটাকে নামিয়ে নিল।

বাদশাহ খুব খুশী হয়ে তাকে আলিঙ্গন করল আর ঘোষণা করল যে তার সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে।

কিন্তু খালিম বলল যে তার জন্য বধূ নির্দিষ্ট হয়েই আছে।

বাদশাহ্‌র ইচ্ছা হল মেয়ের জীবনরক্ষার প্রতিদানে তাকে কিছু দিতে, বলল:

'যা তুমি চাও, বল!'

খালিম পালোয়ান বলল ধূর্ত সাদাকান পালোয়ানের কথা যে তার বাগদত্তাকে নিয়ে চলে গেছে, পরামর্শ চাইল বাদশাহ্‌র কাছে কোথায় কেমন করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাদশাহ নিজের শহরের সব জ্ঞানীদের ডেকে পাঠাল আর বলল তারা যেন ঐ বীরকে ভালো উপদেশ দেয়।

পণ্ডিতরা কয়েকদিন ধরে আলোচনা চালিয়ে তারপর বাদশাহকে জানাল:

'এখান থেকে কাছে আবার দূরেও আছে এক অপূর্ব পাখী সিমুর্গ — পাখীটার মন দয়ালু। এত বড় পাখীটা যে ঠোঁটে করে একটা উট বয়ে নিয়ে যেতে পারে এমনকি। যখন সে ডানা চড়ায় সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, ডানা ঝাপটে ঝড় তুলতে পারে সে। দু'হাজার বছর আয়ু পাখীটার। একমাত্র ঐ সিমুর্গ পাখীই ওকে সাহায্য করতে পারে বাগদত্তাকে খুঁজে পেতে।'

পণ্ডিতদের ধন্যবাদ জানিয়ে খালিম সিমুর্গ পাখীকে খুঁজতে চলল।

অনেক পথ চলে সে এসে পৌঁছাল এক বিশাল চিনার গাছের কাছে, গাছটা এমন উঁচু যে একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। গাছটার গুঁড়ি এমন চওড়া যে যদি সেটাকে কাটা হয় তো সেই কাটা গুঁড়ির ওপর একটা গোটা গ্রাম বসান যায়।

খালিম গাছটার কাছে এগিয়ে দেখল যে গাছের কোটরে রয়েছে পাখীর ছানা, ছানাগুলি

আকারে উটপাখীর মত। পাখীগুলো কি একটা দেখে ভয়ে আকুলি-বিকুলি করছে আর প্রচণ্ড চীৎকার করছে।

খালিম চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল চিনারটার দিকে এগিয়ে আসছে এক বিরাট সাপ মুখ হাঁ করে।

কাঁধের থেকে শেকলটা তুলে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগাল সে সাপটার দিকে, ছুটে এসে দারুণ জোরে শেকল দিয়ে আঘাত করল সে সাপটাকে। সাপটা মরে লম্বা পড়ে গেল মাটিতে। পাখীর ছানাগুলো এবার চীৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করল।

এমন সময় কালো মেঘ ঢেকে ফেলল আকাশটা, খালিম দেখা একটা বিশাল পাখী মুখে উট নিয়ে উড়ে আসছে। পাখীটা এসে বসল চিনারের ডালে, গাছটা কেঁপে উঠল তার ভারে।

উটটাকে টুকরো টুকরো পাখীটা তার ছানাদের মুখে দিতে লাগল। খালিম আন্দাজ করল যে এই হল সিমুর্গ পাখী আর ওগুলো তার ছানা।

সিমুর্গ পাখী দেখল পথে মরা সাপটা আর তার কাছে গাছের ছায়ায় পালোয়ানকে, মানুষের গলায় বলল:

'আগে আগে সাপটা বাসা থেকে ডিম চুরি করত, এবার এসেছিল ছানা চুরি করতে। তুমি, বীর, দেখছি আমার ছানাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ। এর প্রতিদানে তোমার যে কোন অনুরোধ রাখব আমি।'

'ডাইনের গিরিখাতে খিদেয় মরার হাত থেকে তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছিলে নাকি ? লোহার শিকলের প্রান্ত ধরে টেনে তুলে গিরিখাতের থেকে উঠে আসতে আমায় সাহায্য করেছিলে তুমিই তো ?'

'তুমি ঐ বদমাস ডাইনটাকে মেরেছ।' বলল পাখীটা। 'তার প্রতিদানে তোমার বিপদে তোমায় সাহায্য করেছি আমি, আর এখন আর কি সাহায্য করতে পারি বল তো ?'

খালিম তাকে জিজ্ঞাসা করল কি করে সে তার বাগদত্তাকে খুঁজে পাবে।

'তোমার বাগদত্তাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়, কিন্তু আমি তোমায় সাহায্য করব।' বলল সিমুর্গ পাখী। 'তোমাকে তোমার বাগদত্তার কাছে পেঁাছে দেব আমি। দূরের পথ পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হও। না থেমে একটানা উড়তে গেলে চল্লিশটা ভেড়া কেটে তোমার শিকল দিয়ে বেঁধে নিতে হবে আমার পিঠে। তারপর আমার পিঠে বসে শক্ত করে ধরে থাক আমায় যাতে পড়ে না যাও।'

পাখীর নির্দেশমত সব ঠিকঠিক করল খালিম।

নিজের বড় বড়, শক্তিমান ডানাগুলো আওয়াজ করে ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল সিমুর্গ আকাশে, খালিমকে নিয়ে উড়ে চলল বন, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে।

একবারের জন্যও না থেমে উড়ে চলেছে পাখীটা, আর খালিম তার মুখে বড় বড় মাংসর টুকরো পুরে খাওয়াচ্ছে।

শেষে চল্লিশটা ভেড়াই খাওয়া হয়ে গেল, ওদিকে সিমুর্গ উড়ে চলেছে তো চলেছেই।

'আর একটু মাংস দাও, আর সামান্য পথ বাকী আছে।' বলল পাখীটা।

একটুও দেরী না করে খালিম নিজের উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে দিল পাখীর মুখে।

'এসে পেঁৗছেছি আমরা।' বলল শেষে সিমুর্গ। 'এবার সোজা যাবে মস্তবড় একটা বাগানে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত। সেই বাগানেই পাবে তোমার বাগদত্তাকে। এবার আমি ফিরে যাব আমার বাচ্চাদের কাছে।'

খালিম মাটিতে নামল, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে ভীষণ ব্যথা পেয়ে খুঁড়িয়ে থেমে পড়ল।

'কি হল তোমার?' বলল পাখীটা।

খালিমের উরুর ক্ষতচিহ্নটা দেখে সে বুঝল নিজের উরুর মাংস কেটে তাকে খাওয়াতেও দ্বিধা করে নি বীর খালিম।

তখন সিমুর্গ ঠোঁট দিয়ে ছুঁল খালিমের ক্ষতস্থানটা, সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেল ক্ষতস্থানটা, এমনকি কোন চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

খালিম পালোয়ান সিমুর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে, তার বিদায় নিয়ে এগোল নিজের পথে।

একটু পরেই সে এসে পেঁৗছল লোহার পাঁচিল ঘেরা একটা বিরাট বাগানের কাছে। বাগানের ফটকে ধাক্কা দিতে লাগল সে, কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না।

তখন সে থামশুদ্ধ উপরে ভেঙে ফেলল লোহার ফটক, তারপর বাগানে ঢুকে দেখতে পেল নিজের বাগদত্তাকে। বিষণ্ণমুখে সে চিনারগাছের নীচে মাটিতে বসে আছে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে বদমাশ সাদাকান।

খালিম পালোয়ান ছুল ভাণ্ডর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে এমন জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে সে একেবারে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল।

আর নিজের সুন্দরী বাগদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে খালিম পালোয়ান ফিরে গেল দেশে, কাঁধের থেকে লোহার শেকলটা ফেলে দিয়ে বাবামার সংসারে থাকতে লাগল সুখেস্বচ্ছন্দে।

তাঁতী - পালোয়ান

এক ছিল তাঁতী। সারাদিন বসে কেবল তাঁত বুনেই যায়। শেষে একদিন বিরক্তি ধরে গেল তার তাঁত বোনায়, ঠিক করল দুনিয়া ঘুরতে বেরোবে। কাঁধে একটা থলি ফেলে পথে নামল সে।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, হঠাৎ দেখে: মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে একটা কচ্ছপ।

'সঙ্গে নিই এটাকে, হয়ত কাজে লাগবে।' ভেবে তাঁতী সেটাকে থলিতে ভরে নিল।

তারপর আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে খানিক দূরে দেখে পড়ে আছে একটা ঘোড়ার লেজ।

'ভাল জিনিসটা তো, এটাও সঙ্গে নেব, হয়ত কাজে আসবে।' বলে ঘোড়ার লেজটাও তাঁতী থলিতে ভরে নিল।

তারপর আবার চলতে চলতে এক জায়গায় দেখে পড়ে আছে ষাঁড়ের শিং।

'বাঃ, বেশ জিনিসটা তো! এটাও সঙ্গে নেব, হয়ত কাজে লাগবে।' শিংটাকে থলিতে ভরে নিল।

চলতে চলতে সে এসে পৌঁছাল এক বিশাল উঁচু দুর্গের কাছে, দুর্গের লোহার ফটকটা চল্লিশহাত উঁচু।

তাঁতী ফটকে ধাক্কা দিতে লাগল, কেউ সাড়া দেয় না।

আবার ধাক্কা দিল তাঁতী। তখন দুর্গের ভিতর থেকে শোনা গেল জোর একটা আওয়াজ, হেঁড়ে গলায় কে যেন বলল:

'কার এমন সাহস যে ডাইনদের দুর্গের ফটকে ধাক্কা দেয় ? কে তুই ?'

তাঁতী তো তা শুনে কাঁপতে লাগল ভয়ে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

ডাইনরা ওদিকে ভেবেছে কোন পালোয়ান এসেছে তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য, তারা পরীক্ষা করতে চাইল কতখানি শক্তি ধরে ঐ পালোয়ান।

একজন ডাইন তাঁতীর দিকে ছুঁড়ে দিল নিজের মাথার একটা উকুণ যেটা আকারে একটা আরসোলার মত।

'এটা দেখে তুই বুঝতে পারবি আমাদের ডাইনদের চেহারাটা কেমন। এবার তুই দেখা তো তোর কত বড় চেহারা।'

তাঁতী কচ্ছপটা থলি থেকে বার করে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দুর্গের পাঁচিল পেরিয়ে ভিতরে। ঘাবড়ে গেল ডাইনরা সেটা দেখে।

'যদি ওর মাথার উকুনটা অত বড় তো ও নিজে কেমন!' বলতে লাগল তারা।

অন্য এক ডাইন নিজের গোঁফের থেকে একটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল তাঁতীর দিকে। সেটা একটা ছুঁচোর লেজের মত মোটা। তখন তাঁতী থলি থেকে ঘোড়ার লেজটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল দুর্গের পাঁচিল পেরিয়ে ভিতরে। ঘোড়ার লেজটা দেখে ডাইনরা ভাবল যে সেটা সত্যিই ওটা পালোয়ানের গোঁফ, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল তারা।

'এটা কোন এক দানবের গোঁফ!' বলতে লাগল তারা। 'ঠিক আছে, তৃতীয়বার পরীক্ষা করে দেখা যাক ওকে: ওর গলার স্বর কেমন শোনা যাক।'

সবচেয়ে বড় ডাইনটা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে বলল: 'ওহে পালোয়ান! তোমার গলাটা শোনাও দেখি!'

সেই প্রচন্ড চীৎকার শুনে তাঁতী প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল আর গলাও বুঁজে গেল একেবারে। সে তখন থলি থেকে ষাঁড়ের শিংটা নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ফুঁ দিল।

সে আওয়াজ গিয়ে পৌঁছল বহুদূর পর্যন্ত। দুর্গের ভিতরে ডাইনদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

'ঐ পালোয়ান মেরে ফেলবে আমাদের!' বলে চীৎকার করতে করতে তারা যে যদিকে পারল দৌড় দিল।

আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল তাঁতী, দুর্গের ভিতর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। ফটকে ধাক্কা দিল সে, খুলে গেল ফটকটা, তাঁতী দুর্গে ঢুকল। দুর্গের ভিতরের একটা বন্ধ ঘরে সে দেখল একটি মেয়েকে, তার মত অমন সুন্দরী মেয়ে সে দেখে নি আর কখনও।

'কে তুমি বীর? তোমার ভয়ে এমনকি ডাইনরাও পালাল!' অবাক হয়ে বলল মেয়েটি। তাঁতীকে বলল সে যে তাকে ডাইনরা তার বাড়ী থেকে লুঠ করে নিয়ে এসেছে।

মেয়েটিকে মুক্ত করে নিয়ে তাঁতী তাকে নিয়ে চলল তার বাবামার কাছে।

তখনি গ্রামের সবাই জানল যে এক প্রখ্যাত বিজেতা, বীর এসেছে, সবাই তার কাছে এসে সাহায্য চাইতে লাগল।

সেই গ্রামে আসতে আরম্ভ করেছে এক বিশাল ভালুক।

'তুমিও কেবল ওটাকে কাবু করতে পারবে।' গ্রামবাসীরা তাঁতীকে বলল।

6 — 1363

ভয় পেয়ে গেল তাঁতী, কিন্তু না বলতে পারল না কিছুতে। তুঁত গাছের নীচে একটা মস্ত গর্ত খুঁড়তে আদেশ দিল সে। 'এই গর্তটায় বসে আমি অপেক্ষা করব ভালুকটার জন্য।'

সন্ধ্যাবেলায়ই গিয়ে গর্তটার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল তাঁতী।

মাঝরাতে সে শুনতে পেল ভালুকের চীৎকার। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে জ্বরো রুগীর মত। ভালুকটা সোজা এগিয়ে চলল তার গর্তের দিকে। যখন গর্তের ওপরে ভালুকের মাথাটা দেখা গেল তখন ভয়ে তাঁতী এক অদ্ভুত গলায় চীৎকার করে উঠল। এই আচমকা চীৎকার শুনে ভালুকটা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে পিছিয়ে গেল আর তার মাথাটা আটকে গেল তুঁত গাছের ডালপালার মাঝে। যতই ছাড়াবার চেষ্টা করুক না কেন ভালুকটা কিছুই ফল হয় না। তেমনিভাবে ঝুলতে লাগল গাছে।

সকালবেলায় গ্রামবাসীরা পালোয়ান যে ঐ বিশালটাকে কাবু করেছে তার সেই প্রচণ্ড শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেল। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল।

কিছুদিন বাদে সেই গ্রামে হানা দিল ডাকাতের দল। গ্রামবাসীরা তাঁতীর কাছে ছুটে গিয়ে বলল:

'এখন ভরসা কেবল তুমিই, বাঁচাও আমাদের, পালোয়ান!'

বেচারী তাঁতী জীবনে হাতে অস্ত্র নেয় নি কখনও, কিন্তু না বলতে পারল না। একটা বুড়ো, রোগা ঘোড়াকে আনতে বলল সে, আপাদমস্তক সাদা পোশাকে ঢেকে ঘোড়ায় উঠে বসল, তারপর বলল ঘোড়ার জিনের সঙ্গে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধতে তাকে, এমনিভাবে শহর ছেড়ে এগোল সে।

ঘোড়াটার চেহারা কদাকার হলেও বেশ লড়াইবাজ কিন্তু। দূরে শত্রুপক্ষের ঘোড়ায় চড়া লোকদের দেখে দারুণ জোরে ছুট লাগাল সেদিকে। তাঁতী কিছুতেই থামাতে পারে না তাকে। ভয়েতে সে পথের ধারের একটা কচি দেবদারু গাছ আঁকড়ে ধরল। ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে ছুটে চলল দেবদারু গাছটা তাঁতীর হাতে উঠে এল। মরীয়া হয়ে তখন সে অন্য হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল একটা কচি অশ্বথ গাছ। ঘোড়াটা ছুটেই চলল একটুও না থেমে। শেকড় উপড়ে উঠে এল অশ্বথ গাছটা তাঁতীর হাতে, তেমনিভাবেই ছুটে চলল তারা। দস্যুরা দেখল তাদের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ধেয়ে আসছে এক পালোয়ান, সাদা পোশাক পরা এক হাতে দেবদারু গাছ একটা ধরা, অন্য হাতে অশ্বথ গাছ ধরা। এমন ভয় পেল তারা যে তখুনি উল্টোদিক ফিরে দে দৌড়। তাঁতীর ঘোড়া থামল তখনই যখন শেষ শত্রুটা পর্যন্ত পালিয়েছে।

পালোয়ানের সাহস দেখে সব লোকে একেবারে হতভম্ব। বিশেষ সম্মান-অভ্যর্থনা জানান হল তাকে। কিন্তু পালোয়ানের ভূমিকা নিতে আর সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকায় ঘেন্না ধরে গেল তাঁতীর। সে ভাবল: 'তিন বার বিপদের হাত থেকে বেঁচেছি, চতুর্থবার বাঁচতে পারব কিনা তা কে বলতে পারে!'

রাতের বেলায় তাঁতী চুপিচুপি গ্রাম ছেড়ে চলে গেল নিজের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বাড়ী ফিরে আবার সে তাঁত বুনতে লাগল।

পিতৃ উপদেশ

এক ছিল ময়দাকলের মালিক। তার ছিল তিন ছেলে। নিজের বয়স হয়েছে, মরার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে সে বড় ছেলেকে কাছে ডেকে বলল:

'আমি মরতে বসেছি। উত্তরাধিকার হিসাবে কি চাস তুই আমার কাছে — ধনসম্পদ না পিতৃ উপদেশ?'

'ধনসম্পদ ছাড়া আবার কি!' বলল সে ছেলে। 'শুধু উপদেশে কি আর পেট ভরে।'

'ঠিক আছে। তুই পাবি আমার ময়দাকল, আর আমার ধনের অর্ধেক, যেমন চাস তেমনি ভাবেই থাকবি।' বলল তার বাবা।

তারপর লোকটি মেজ ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল সেই একই কথা।

'ধনসম্পত্তি দিও, বাবা। শুধু উপদেশ নিয়ে বাঁচা যায় না এ জগতে।'

'ঠিক আছে আমি মরলে তুই পাবি আমার বাড়ীটা আর আমার ধনের অর্ধেক, যেমন ভাল মনে করিস তেমনি ভাবে থাকিস।' বলল তার বাবা।

তারপর লোকটি সবার ছোট ছেলেকে ডেকে বলল:

'আমার মরার সময় এসেছে, বাবা। তোর জন্য কি রেখে রেখে যেতে বলিস — ধনসম্পদ না উপদেশ?'

'তুমি যদি মরে যাও, বাবা, তোমার উপদেশ ছাড়া আমি বাঁচব কি করে?' বিষণ্ণ মুখে বলল ছোট ছেলে। 'ধনসম্পত্তি চাই না আমার। আমার জন্য রেখে যেও উপদেশ, জীবনে অনেক প্রয়োজনে কাজ করব তোমার উপদেশ মত।'

'ভালো ছেলে তুই!' বলল বাবা। 'শোন তাহলে আমার উপদেশ: আমি যখন মরে যাব, তিন রাত পরপর যাবি আমার কবরের কাছে, তখনই বুঝতে পারবি কি করতে হবে তোকে।'

সে রাতেই মারা গেল লোকটি।

কান্নাকাটি করল ভাইরা, বাবাকে কবর দিয়ে ধনসম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিল। ছোট ভাইয়ের ভাগে কিছুই পড়ল না, এমনকি মাথা গোঁজার জায়গাও রইল না তার একটুও।

বড় ভাই তাকে বলল:

'আমার কাছে থাক আপাতত।'

মেজ ভাই বলল:

'ইচ্ছে হলে আমার কাছেও থাকতে পারিস।'

বড় দুই ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট ভাই বলল:

'শুধু শুধু তোমাদের ঘাড়ে বসে খাব না। তোমাদের ভেড়ার পাল চরাব আমি।'

বাবার মৃত্যুর পরে প্রথম রাতে ছোট ছেলে গেল বাবার কবরের কাছে, তখনও ঘোর অন্ধকার, ভোর হতে বাকী আছে বেশ। বাবা আর নেই সে কথা মনে করে কাঁদল বসে বসে। হঠাৎ ঘোড়ার ডাক শুনে মুখ তুলে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক চমৎকার কালো ঘোড়া, ঘোড়ার ঘন কেশর আর লম্বা লেজ। তার জিনটা সোনার আর সাজ রুপোর আর পিঠে তার পাখনা।

'বস আমার পিঠে, যেখানে চাও উড়িয়ে নিয়ে যাব।' বলল ঘোড়াটি।

'উড়ে চলে যেতে তো পারি না আমি, ভেড়া চরাবে কে তাহলে আমার বদলে।'

'আমার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নাও, লুকিয়ে সাবধানে রাখবে। যদি কখনও আমার সাহায্য প্রয়োজন হয় তো ওই গোছা থেকে একটি চুল নিয়ে পোড়াবে — তখনি আমি উড়ে চলে আসব তোমার কাছে।'

ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নিল ছেলেটি রুমালে বেঁধে লুকিয়ে রাখল চুলগুলি, ঘোড়াটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয় রাতেও ভোর হবার আগে ছোট ছেলে গেল বাবার কবরের কাছে, বাবার কথা মনে করে কাঁদল বসে। হঠাৎ আবার ঘোড়ার ডাক শুনল। মুখ তুলে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাদামী ঘোড়া দাঁড়িয়ে, ঘাড়ের চুল ফোলান-ফাঁপান, লম্বা লেজ। তার পিঠের জিনটা সোনার, সাজ রুপোর আর পিঠে পাখনা।

'বোস আমার পিঠে, যেখানে চাও উড়িয়ে নিয়ে যাব।' বলল ঘোড়া।

'উড়ে যাবার সময় নেই আমার। আমার ভাইদের ভেড়ার পাল চরাই আমি।' বলল ছেলেটি।

'আমার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নাও, লুকিয়ে যত্ন করে রেখে দিও। যখনি আমার সাহায্য দরকার হবে ঐ গোছার থেকে একটা চুল নিয়ে পোড়াবে অমনি আমি উড়ে চলে আসব।'

ছেলেটি বাদামী ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নিল, ঘোড়াটি অমনি উধাও হয়ে গেল।

তৃতীয় রাতেও ভোর হবার আগে আবার ছেলেটি গেল বাবার কবরের কাছে। বাবার কথা মনে করে কাঁদতে লাগল সে। হঠাৎ শোনে ঘোড়ার ডাক। মুখ তুলে দেখে তার সামনে এক

চমৎকার সাদা ঘোড়া, লম্বা ঘন কেশর তার আর লম্বা লেজ। তার পিঠের জিন সোনার, সাজ রূপোর আর পিঠে পাখনা।

'বোস আমার পিঠে, যেখানে খুশী যাও।' বলল ঘোড়াটি।

'আমার কোথাও গেলে চলবে না, আমার ভাইদের ভেড়ার পাল চরাই আমি।' বলল ছেলেটি।

'তাহলে আমার ঘোড়ের থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নাও। যখনি কোন প্রয়োজন হবে তার থেকে একটি চুত নিয়ে পুড়িও অমনি আমি উড়ে চলে আসব।'

ছেলেটি সাদা ঘোড়ার ঘাড় থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নিল ঘোড়াটা সামান্য চিঁহি ডাক ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিন যায়, বড় ভাইদের ভেড়ার পাল চরায় ছেলেটি। প্রতিদিন ভোরবেলায় মাঠে নিয়ে যায় ভেড়ার পাল আর সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আস্তাবলের এক কোনাতেই সে থাকে, আলাদা রান্না করে খায়, নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই তার।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভেড়ার পাল ঘরে তাড়িয়ে ফেরার সময় শুনল শহরের পথে পথে নকীব হেঁকে বেড়াচ্ছে:

'বাদশাহ জানতে চান কে দেশের সবচেয়ে দক্ষ অশ্বারোহী। যে বেগে ছুটতে ছুটতে এসে প্রাসাদের চল্লিশধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে তাকে বাদশাহ করবেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আর নিজের রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন।'

প্রতিযোগিতার দিন প্রাসাদের সামনের চত্বরে জড় হল সব শহরবাসী। বড় দুই ভাইও দুটু সেখানে গেল। ওদিকে ছোট ভাই কোন তাড়াহুড়ো না করে ভেড়ার পাল ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে এসে মুখ-হাত ধুয়ে গিয়ে গেল বাবার কবরের কাছে। বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক, তারপর লুকিয়ে রাখা কালো ঘোড়ার চুলের গোছা থেকে একটা চুল নিয়ে পোড়াল। অমনি তার সামনে উপস্থিত হল কালো ঘোড়া। সোনার জিনের ওপর রয়েছে দামী পোশাক।

'তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।' বলল ঘোড়া।

সুন্দর পোশাক পরে কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছেলেটি পেঁছাল শহরে। রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। বাড়ীগুলোর ছাদে ছাদে ঢাক ঢোল বাঁশী বাজিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসা অশ্বারোহীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

বাদশাহের প্রাসাদের সামনে বিভিন্ন রংয়ের পোশাকপরা অশ্বারোহীতে ভরে গেছে, তাদের ঘোড়াগুলি চমৎকার আর দামী সাজ পারান। কিন্তু ভেড়ার পাল চরায় যে ছেলেটি তার আবির্ভাব সবার চোখ টানল। কালো ঘোড়ায় চড়া যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

ইতিমধ্যে অনেকেই নিজের দক্ষতা দেখাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই সেই উঁচু সিঁড়ির মাঝখান পর্যন্ত ও গিয়ে পেঁছাতে পারে নি।

এবার এল কালো ঘোড়ায় চড়া যুবকটির পালা। কিন্তু সিঁড়ির মাঝ বরাবর ছুটে যাবার পর তার ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, আর দৌড়তে পারল না, ফিরে এল।

প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা শেষ হল। ফিরে যেতে লাগল ব্যর্থতায় হতাশ অশ্বারোহীরা। ভীড়ের লোকরাও ঘরে ফিরে যেতে লাগল প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে আগামী দিনের প্রতিযোগিতার কথা।

কালো ঘোড়ায় চড়া যুবক ওদিকে ঘোড়া ছোটাল বাবার কবরের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমে তাড়াতাড়ি নিজের পুরান পোশাকটা পরে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলল বাড়ীর দিকে যাতে বড় ভাইদের আগে সে ফিরতে পারে।

ভাইরা বাড়ী ফিরে খুশীমনে, একসঙ্গে ছোট ভাইকে বলতে লাগল কালো ঘোড়ায় চড়া সেই অজানা যুবকের কথা, যে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল সবচেয়ে ওপরে।

পরের দিন বড় দু'ভাই আবার গেল প্রাসাদের কাছে আর ছোট ভাই সকাল সকাল ভেড়ার পাল ফিরিয়ে নিয়ে এসে মুখ-হাত ধুয়ে চলল বাবার কবরের দিকে। সেখানে বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক, তারপর বাদামী ঘোড়ার চুলের গোছা থেকে একটা চুল নিয়ে পোড়াল। তখনি তার সামনে এসে হাজির হল সুন্দর বাদামী ঘোড়াটা, পিঠে সোনার জিন, রুপোর সাজ, জিনের ওপর রয়েছে পোশাক, কালকের পোশাকের চেয়ে আরও সুন্দর ও দামী।

'তৈরী হয়ে নাও।' বলল ঘোড়াটি। বাদামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছেলেটি গেল প্রাসাদের কাছে। আবার রাস্তায় রাস্তায় লেকের ভীড়, ঢাক ঢোল, বাঁশী বাজছে। ছেলেটিকে চিনতে পারল সবাই, কালকের চেয়ে আরও চীৎকার করে তারা উৎসাহ দিতে লাগল তাকে, তার আর তার দামী সাজপরা বাদামী ঘোড়ার সৌন্দর্যে আরও বেশী অবাক হল সবাই।

এদিনও অনেক অশ্বারোহীই চেষ্টা করল সিঁড়ি দিয়ে ঘোড়ায় ছুটিয়ে উঠে যেতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! কেউই এমনকি সিঁড়ির মাঝ বরাবরও পেঁছাতে পারল না।

বাদামী ঘোড়ায় চড়া ছেলেটি এসে পেঁাছেছে সবার শেষে, তাই সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলও সংশেষে। সহজে, দ্রুতবেগে তার ঘোড়া ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ঐ যে সে পেঁাছেছে সিঁড়ির মাঝ বরাবর, আরও এগিয়ে যাচ্ছে সে। ভীড়ের মধ্যে শোনা গেল আনন্দ-উচ্ছাস। কিন্তু তিরিশ ধাপ পেরিয়ে বাদামী ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, আর যেতে পারল না ওপরে, ফিরে গেল। এত উঁচু সিঁড়িটা !

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনও শেষ হল।

সন্ধ্যাবেলায় বড় দু'ভাই আবার বাড়ী এসে ছোট ভাইকে বলতে লাগল প্রতিযোগিতার কথা আর অজানা সেই যুবকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল।

তৃতীয় দিনেও ছোট ভাই সকাল সকাল ভেড়ার পাল ফিরিয়ে নিয়ে এসে, মুখ-হাত ধুয়ে আবার চলল বাবার কবরের দিকে। সেখানে বসে বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক। তারপর সাদা ঘোড়ার চুল একটা বার করে পোড়াল। তখনই তার সামনে এসে হাজির হল তুলোর মত সাদা ঘোড়াটা। পিঠে তার সোনার জিন, রুপোর সাজপরা, ঘোড়ার জিনের ওপর রাখা রয়েছে বাদশাহ্‌র পোশাকের চেয়েও দামী পোশাক।

ছেলেটি পোশাক বদলে, ঘোড়ায় চড়ে চলল শহরের দিকে।

বাদশাহ ঘোষণা করেছেন যে আজই শেষ দিন প্রতিযোগিতার।

সাদা ঘোড়ায় চড়া যুবকটি আজ আগের দিনের চেয়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তার সাদা ঘোড়াটা চলছে যেন নেচে নেচে, চমৎকারভাবে ঘাড় নুইয়ে। ভীড়ের লোকরা চীৎকার করে তাকে উৎসাহ দিল।

সব অশ্বারোহীদের সার বেঁধে দাঁড় করান হয়েছে আর তারা পালা দিয়ে একের পর এক ওঠার চেষ্টা করবে সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু আজও কেউই সিঁড়ির মাঝ পর্যন্তও যেতে পারল না।

সবার শেষে সাদা ঘোড়ায় যুবক এগোল। সহজ দ্রুতগতিতে ঘোড়াটা ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মাঝ পর্যন্ত পেঁাছে এগিয়ে চলল আরও। বাকী রয়েছে আর মাত্র কয়েক ধাপ...

চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য নানা ধরণের চীৎকার। যুবকটি ঘোড়াকে মারল চাবুক দিয়ে। ঘোড়াটা পাখীর মত উড়ে গেল যেন ওপরে। এক লাফে শেষ কয়েক ধাপ পেরিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির শেষে প্রশস্ত চত্বরে। জয়ীকে ভীড়ের লোকরা অভিনন্দন জানাল চীৎকার করে। ঢাকঢোল, বাঁশী বেজে উঠল জোরে জোরে। বাদশাহ সেই চত্বরে বেরিয়ে এসে জয়ীকে আলিঙ্গন করে ঘোষণা করলেন যে তিনি সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করছেন আর দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন, কিন্তু যুবকটি উধাও হয়ে গেছে ততক্ষণে। ঝড়ের মত গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সে ঘোড়া চালাল বাবার কবরের দিকে। সেখানে পোশাক বদলে আবার নিজের পোশাক পরে বাড়ী ফিরে গেল।

বড় দুই ভাই বাড়ী ফিরে আবার বলতে গেল সেই সফল যুবকটির কথা যে সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠতে পেরেছে আর হঠাৎ কেমন সে অদৃশ্য হয়ে গেল তা ভেবে অবাক হল।

পরের দিন ভোরবেলায় ছোট ভাই ভেড়ার পাল চরতে ছেড়ে দিয়ে এসে নিজে গেল বাবার কবরের কাছে বাবার কথা মনে করে কাঁদল খানিক। তারপর সাদা ঘোড়ার চুল আর একটা বার করে পোড়াল। আবার তার কাছে হাজির হল সাদা ঘোড়া। তার সোনার জিনের ওপর রয়েছে আগের দিনের চেয়েও আরও সুন্দর পোশাক।

ছেলেটি সে পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে শহরে গেল।

সেদিন সকালে বাদশাহ্‌র সৈন্যদলের শোভাযাত্রা হবে ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার হাজার সৈন্য এসে জড় হয়েছে প্রাসাদের সামনের চত্বরে। এমন সময়ে কালকের সেই বিজেতার আবির্ভাব হল। তার ঘোড়া যেন উড়ে চলেছে। নিজের ভাইদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ঘোড়ার একটু রাশ টেনে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল আর হাত নাড়ল। ভাইরা তাকে চিনতে পারল, অবাক হয়ে চীৎকার করে বলল:

'ভাই রে, তুই ?!'

'হ্যাঁ আমি! তোমাদের ভেড়ার পাল ফিরিয়ে আনতে ভুলো না যেন।' তাদের একথা বলে সে সেনাদলের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

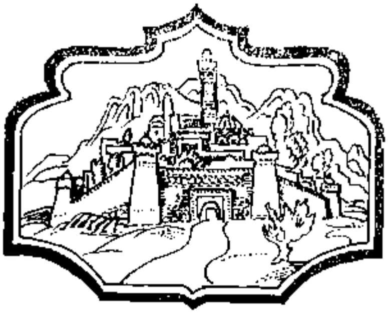

গাঁজাখুরী গল্পের লড়াই

গার্ম শহর থেকে এক পালোয়ান এল হীসার শহরের বাজারে সেখানকার পালোয়ানের সঙ্গে শক্তির লড়াই করে দেখার ইচ্ছা হল তার।

'এস দেখা যাক, আমাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?' বলল গার্মের পালোয়ান।

লড়াই আরম্ভ হল তাদের। সে লড়াই দেখতে লোক জড় হল।

লড়াই করতেই লাগল তারা, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারে না কিছুতেই। সূর্য পাটে বসেছে। আঁধার নামছে ওদিকে। তখন গার্মের পালোয়ান গীসারের পালোয়ানকে বলল:

'চল, চাখানায় যাওয়া যাক, চা খাওয়া যাবে আর বাজী রেখে দেখব কে যেতে। আমাদের মধ্যে যে বলতে পারবে সবচেয়ে বড় গাঁজাখুরী গল্প যে গল্পে উপস্থিত শ্রোতাদের কেউ বিশ্বাস করবে না, সেই জিতবে।'

'ঠিক আছে।' বলল হীসারের পালোয়ান। 'এটা তোমার পরিকল্পনা যখন তখন তুমিই আরম্ভ করবে।'

তার চাখানায় গেল, চা খেতে লাগল, লোকেরাও চলল তাদের পিছন পিছন। গার্মের পালোয়ান আরম্ভ করল তার গল্প:

'আমার বাবা গাড়ী বোঝাই করে আখরোট নিয়ে বাজার রওনা দিল বেচবে বলে। এমন সময় বৃষ্টি নামল। বস্তার মধ্যে আখরোটগুলো ভিজে গাছ গজান আরম্ভ হল। ছোট ছোট চারাগাছগুলো বড় বড় গাছ হয়ে গেল। বাবা কিছু বোঝার আগেই গাছে আখরোট ধরল, হাওয়ায় সেগুলো নীচে পড়তে লাগল আর পড়তে লাগল একেবারে পথচারীদের মাথায়। পথচারীরা রেগে গিয়ে মাটির ঢেলা, পাথর ছুঁড়তে লাগল গাড়ীর দিকে। তার ফলে তৈরী হল একবিঘা জমি।

গমের চাষ করতে লাগল আমার বাবা। গমের বীজ পুঁতল, দেখে অমনি ফসল তোলার সময় এসে গেছে। ফসল তুলে মাড়াই করার সময় গমের দানার বদলে বার হতে লাগল মোরগ আর বিচালির থেকে বার হতে লাগল মুরগী। মুর্গীগুলো অনেক ডিম পাড়ল, ডিমগুলো ফুটে তখনি বাচ্চা হল, তারা সংখ্যায় এত যে ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল তারা মেঘের মত। এই হল আমার বাবার জীবনে। বলতে চাও — এমন ঘটে নি ?' জিজ্ঞাসা করল গার্মের পালোয়ান।

'এ সবই সত্যি।' বলল হীসারের পালোয়ান। 'এবার শোন আমার বাবার কথা।'

'বছরে একবার করে আমার বাবা বনে যেত, কাঠ কেটে কেটে একশ'টা গাছের মত উঁচু করে জড় করত। সেই বিশাল কাঠের গাদা নিয়ে আসত গ্রামে। সারা বছর গোটা গ্রামের লোক জ্বালাত সেই কাঠ তবুও এক বছরে ফুরোত সে কাঠ, অর্ধেক কাঠ থেকেই যেত। সেই বাকী কাঠগুলো জড় করে আগুন জ্বালিয়ে দিত বাবা আর গ্রামবাসীদের বলত সেই আগুনের শিখা লাফ দিয়ে পার হতে। আকাশছোঁয়া আগুনের শিখা লাফ দিয়ে পেরোতে সাহস করে না কেউই, কেবল আমার বাবাই লাফ দিয়ে পেরোত সেই আগুনের শিখা, তারপর যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে আবার বনে যেত কাঠ কাটতে।

'তোমার বাবা আমার পালোয়ান বাবার কথা শুনেছিল, আমার বাবার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামার উদ্দেশ্যে একদিন এল আমাদের গ্রামে। ঐ দিনই আমার বাবা কাঠ কাটতে গিয়েছে বনে। তোমার বাবা অপেক্ষা করবে না ভেবে নিজেই গেল আমার বাবার খোঁজে। খানিক দূরে গিয়েই দেখে তার দিকে এগিয়ে আসছে কাঠের এক পাহাড়, আর কাটা গাছের সবুজ ডালপালায় আড়ালে চাপা পড়েছে কাঠুরে। সেই পাহাড়টা তোমার বাবাকে পেরিয়ে চলে গেল। তখন তোমার বাবা পিছন পিছন চলতে লাগল আর দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের গোছার থেকে বেরিয়ে থাকা কাঠের টুকরোগুলো টেনে বার করে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। টানছে তো টানছেই পাহাড়টা কিন্তু থামে না, এগিয়েই চলেছে। শেষে সে আর খানিক জোরে টান দিতেই কাঠের গোছায় বাঁধা দড়িটা ছিঁড়ে গেল, সব কাঠ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

'তুই আমার কাঠ চুরি করছিস কেন ? লজ্জা করে না ?' চেঁচিয়ে উঠল আমার বাবা।

'তোমার কাঠে আমার কোন প্রয়োজন নেই।' বলল তোমার বাবা। 'আমার দরকার তোমাকে। তোমার মত পালোয়ানকেই খুঁজছি আমি। এসো দেখি শক্তি পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

'চল, বাজারে যাওয়া যাক, লোকজনের মাঝে লড়াই হবে, যাতে সবাই দেখতে পায় আমাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী।' বলল আমার বাবা।

'কোথাও যাব না আমি, এইখানে লড়াই করব।' বলল তোমার বাবা।

'কিন্তু এখানে সাক্ষী হবে কে ?' বলল আমার বাবা।

এমন সময় সেখান দিয়ে এক বুড়ী যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে। তার মাথায় একটা বড় গোল ঝুড়িতে পশম রয়েছে, হাতে ধরে রয়েছে টেকো আর পশমের গোলা। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে বুড়ী আর একটুও না থেমে পশমের সুতো কেটে যাচ্ছে।

'বুড়ীমা, তুমি আমাদের সাক্ষী হও।' বলল তোমার বাবা।

'খুব তাড়া আছে আমার!' বলল বুড়ী। 'তোমরা দু'জনেই শক্তিশালী, তাই লড়াই চলবে অনেকক্ষণ ধরে। ইচ্ছে হলে তোমরা আমার ঝুড়িতে উঠে আমার ওপরে লড়তে পার।'

দুই পালোয়ানই বুড়ীর ঝুড়িতে উঠে লড়াই আরম্ভ করল ওদিকে বুড়ী চলতে আর সুতো কাটতে লাগল।

হঠাৎ এক বালির ঝড় উঠল। পালোয়ানদের চোখে এসে পড়ল বালি। চোখ রগড়ে রগড়ে তারা বালিদানাগুলো বার করল, প্রতিটির ওজন পাঁচশ'মন করে।

বালিদানাগুলো মাটিতে ফেলে দিল তারা। বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে। পালোয়ান দু'জন আবার লড়াই করতে লাগল।

'এসে গেছি আমি আর সুতোকাটাও শেষ হয়েছে আমার।' হঠাৎ একথা বলে বুড়ী মাথা নীচু করল। দুই পালোয়ান এসে পড়ল মাটিতে, কেউ কাউকে হারাতে পারল না তারা কিছুতেই।'

উপস্থিত সবাই সে গল্প শুনে জোরে হেসে উঠল আর হীসারের লোকটির প্রশংসা করতে লাগল।

'থাম সবাই! আমি এখনও হার স্বীকার করছি না!' বলল গার্মের পালোয়ান। 'শোনো আমার গাঁজাখুরী গল্প। সবাই জানে যে তোমার দাদু আমার দাদুর ক্রীতদাস ছিল', বলতে আরম্ভ করল সে। 'আর তুমি আমাদের রাখালের কাছে সাহায্য করতে, আমাদের বাছুরগুলোকে চরাতে। ঘোড়ার বাচ্চা চরাতে দেওয়া হত না তোমায় — তুমি এমন রুগ্ন দুর্বল ছিলে...'

'মিথ্যা কথা।' চীৎকার করে উঠল হীসারের পালোয়ান। 'কোনোদিনও তোমাদের বাছুর চরাই নি আমি! আর আমার দাদুও কখনও তোমার দাদুর ক্রীতদাস ছিল না!'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! তুমি নিজেই যখন বলছ যে আমি মিথ্যাকথা বলছি তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি জিতলাম!' বলল গার্মের পালোয়ান।

সবাই হাসতে আরম্ভ করল, বলল যে গার্মের পালোয়ানেরই জয় হয়েছে, সে-ই সবচেয়ে বড় মিথ্যা বলেছে।

পৃথিবী বিজেতা গাধা

এক গরীবলোক ছিল, যার না ছিল বাড়ীঘর, না না ছিল জমিজমা, ছিল কেবল এক রোগা বুড়ো গাধা।

লোকটি একদিন শুনল যে দুনিয়ায় এমন এক দেশ আছে যেখানে কেউ কখনও গাধা দেখে নি।

'সেখানেই নিয়ে যাব আমার গাধাটাকে, হয়ত সেখানে কেউ কিনে নেবে ওটাকে আমার কাছ থেকে।' ভাবল লোকটি।

গাধার পিঠে বসে সে সেই দেশ খুঁজতে বেরোল। অনেক পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ পেরিয়ে শেষে খুঁজে পেল সেই দেশটা যেখানে কেউ কখনও গাধা দেখে নি।

তারা শহরে ঢোকামাত্রই শহরবাসীরা ছুটে এল চারদিক থেকে সেই অদ্ভুত জীবটাকে দেখতে। হঠাৎ জোরে ডেকে উঠল গাধাটা। গাধার সেই কান কাটান চীৎকারে ভয় পেয়ে পালাল সবাই। গাধাটা প্রাণভরে চীৎকার করে তবে থামল। তখন আবার স্বস্তি পেয়ে লোকে গাধার কাছে এসে তার মালিককে জিজ্ঞাসা করতে লাগল:

'এ আবার কি আশ্চর্য জন্তু ?'

'এ হল পৃথিবী বিজেতা।' ধূর্তহাসি হেসে বলল মালিক।

ভীড়ের লোকেদের মধ্যে বাদশাহ্‌র অন্তরঙ্গ কিছু লোকও ছিল।

'যদি এ পৃথিবী বিজেতা হয় তো অবিলম্বে বাদশাহকে খবর দেওয়া উচিত। তা না হলে আর কারো হাতে গিয়ে পড়তে পারে।' বলাবলি করতে লাগল পারিষদরা।

গাধা আর তার মালিককে নিয়ে তারা চলল বাদশাহ্‌র কাছে। প্রাসাদের বারান্দা থেকে বাদশাহ দেখল সেই অদৃশ্যপূর্ব জন্তুটিকে। এমন সময় গাধা মাথা তুলে ডাক ছাড়ল আবার।

বাদশাহ্র মনে হল যেন প্রাসাদের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। গাধার কান ফাটান চীৎকারে প্রাসাদের আস্তাবলের ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে দড়িদড়া ছিঁড়ে দৌড় লাগাল। হৈচৈ পড়ে গেল। প্রাসাদের লোকজনরা তাড়াহুড়োয় একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দরজা, ফটকগুলোতে ভীড় জমিয়ে তুলল।

এ সবের মাঝেও শান্তভাবে গাধাটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হল বাদশাহ।

'আশ্চর্য জন্তু তো! ও বুড়ো, পৃথিবী বিজেতাকে বেচবে নাকি আমার কাছে?' জিজ্ঞাসা করল গরীব লোকটিকে।

'বেচব।'

'কত চাস?'

'গাধার সমান ওজনের সোনা-রুপো।'

'কিনে নিন ওটা, হুজুর, যে কোন দেশ জয় করে আপনাকে আরও অনেক ধনী করে দেবে।' পরামর্শ দিল বাদশাহ্র উজীররা।

বাদশাহ গাধাটা কিনতে আদেশ দিল, গরীবলোকটি পেল গাধার সমান ওজনের সোনা-রুপো। বাদশাহ্র লোকজনরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে কেমন করে পৃথিবী বিজেতার পরিচর্যা করা দরকার, কি খাওয়ান দরকার।

'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আস্তাবলে রাখতে হবে ওকে, আস্তাবলের দেওয়াল যেন হয় সাদা মসৃণ। ডাবরটাকে উঁচু করে রেখে তাতে দিতে হবে বিচালিকুচি, যব আর কিসমিস। আর জল খাওয়াতে হবে আস্তাবলেই বালতি করে। যখন বাদশাহ্র যুদ্ধ করার ইচ্ছা হবে তখন পৃথিবী বিজেতাকে আস্তাবল থেকে বার করে এনে শত্রুর দিকে ছেড়ে দিতে হবে। দেখবেন তখন, কি হয়।' বলল গরীব লোকটি।

সোনারুপো পেয়ে লোকটি দুটো ঘোড়া কিনল। বাকী সোনারুপোগুলো থলিতে ভরে নিয়ে ফিরে চলল নিজের দেশে।

বাদশাহ যে পৃথিবী বিজেতাকে কিনেছে এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের দেশগুলিতে। প্রতিবেশী রাজ্যের বাদশাহরা জানতে পারল যে পৃথিবী বিজেতাকে এখন খাইয়ে-দাইয়ে আটা-সোটা করা হচ্ছে, কিছুদিন বাদেই তাকে দিয়ে অন্যান্য দেশ জয় করান হবে।

সেই বাদশাহদের একজন ভাবল: 'যতক্ষণে ওরা পৃথিবী বিজেতাকে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরী করছে তার মধ্যেই কাজ সারতে হবে।

এক রাতে সে নিজের সব সৈন্য নিয়ে এসে গাধার মালিক যে বাদশাহ, তার শহর ঘিরে ফেলল।

শহরটা ছিল এক উঁচু পাহাড়ের ওপরে। সকালে শহরবাসীরা দেখে অসংখ্য শত্রু সৈন্য ঘিরে ফেলেছে তাদের।

শহর অবরোধের কথা জানতে পেরে বাদশাহ আদেশ দিল পৃথিবী বিজেতাকে নিয়ে এসে শত্রুদের ওপর ছেড়ে দিতে।

এ পর্যন্ত গাধাকে এক বারের জন্যও বার করা হয় নি আস্তাবল থেকে। খাওয়ান হয়েছে কেবল কিসমিস, যব আর বিচালিকুচি মিশিয়ে। জল খাওয়ান হয়েছে আস্তাবলেই বালতি করে। খেয়ে খেয়ে গাধাটা এমন মোটা হয়ে গেছে যে আস্তাবলের দরজা দিয়ে বার হতে পারছে না। আস্তাবলের দেওয়াল ভাঙতে হল তাকে বাইরে আনার জন্য।

দাসরা তাকে শহরের প্রবেশ পথের কাছে নিয়ে গেল। গাধার গলার বাঁধন খুলে দিয়ে প্রবেশ পথ খুলে তাকে বাইরে ছেড়ে দিল।

গাধাটা এতদিন বন্ধ থেকেছে আস্তাবলে, খোলা মাঠ, ঘাস দেখে নি। খোলা বাতাসে তার আনন্দ হল খুব। এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল সে পাগলের মত। তারপর মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল, পা ছুঁড়তে লাগল।

গাধাটাকে ঘিরে ধুলোর ঝড় উঠল, সে ধুলোর পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল গাধাটা।

গাধার কীর্তিকাণ্ড দেখে বাদশাহের শত্রুসেন্যরা ভয় পেয়ে গেল। পৃথিবী বিজেতার দিকে কেউ এগোতে সাহস করল না। তারপর প্রাণভরে গড়াগড়ি খেয়ে যখন লাফিয়ে উঠল গাধাটা, সামনে দেখতে পেল হাজার হাজার লোকজন আর অনেক ঘোড়া, তখন ভাবল যে ঘোড়ার পাল নিয়ে চরাতে বার করা হয়েছে খোলা মাঠে। আকাশের দিকে মুখ তুলে কান ফাটান চীৎকার ছাড়ল গাধাটা পরপর কয়েকবার। তারপর কানদুটো উঁচু করে সোজা ধেয়ে গেল শত্রুসৈন্যর দিকে। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে শত্রুসৈন্য পিছু ফিরে চোঁচা দৌড় দিল সেই ভয়ংকর জীবের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

সেই আশ্চর্য বিজয়ী বীরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সব দেশে। প্রতিবেশী দেশগুলির বাদশাহদের কেউই আর সেই শক্তিশালী দেশকে আক্রমণ করে নি। আর বাদশাহ দারুণ খুশী হয়ে পৃথিবী বিজেতাকে আরও ভালো করে খাওয়াতে আদেশ দিল। প্রতিদিন তাকে আরও বেশী করে যব আর কিসমিস দেওয়া হতে লাগল।

গাধাটা ফুলে ফেঁপে একেবারে গোল, বেলুনের মত হয়ে উঠল।

শেষে এমনি করে খেতে খেতে একদিন তার পেট ফেটে গেল।

কথাবলা মোহর

এক গ্রামে এক কিপ্পণ বুড়ো ছিল। নিজে সে ছেঁড়া পোশাক আশাক পরে থাকে, ছেলেমেয়ে, বউকে রাখে আধপেটা খাইয়ে, নিজেও পেটভরে খায় না — এমনি ভাবে অর্থ জমাবার চেষ্টা করে। এক ঘড়া সোনার আর এক ঘড়া রুপোর মোহর জমিয়ে সে নিজের বাড়ীর বেড়ার নীচে মাটিতে পুঁতে রেখে দিল।

কিন্তু সে বছর ফসল মোটে হল না, তাই বুড়োর মনে পড়ল সেই সঞ্চিত ধনের কথা।

একটা কোদাল নিয়ে গিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল সে ধন তুলবে বলে। সোনার মোহরভরা ঘড়াটা তুলে যেই খুলতে যাবে অমনি কে যেন বলে উঠল: 'ছুঁয়ো না — এ হল কুরবানের ধন!'

'আরে এ আবার কি?' অবাক হল বুড়ো, তাড়াতাড়ি সে ঘড়ার মুখটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে রুপোভরা ঘড়াটা খুলতে লাগল। সে ঘড়ার মুখটা খোলা মাত্র আবার শুনতে পেল: 'ছুঁয়ো না — এ হল কুরবানের অর্থ!'

'এ সবের মানে কি?!' চীৎকার করে উঠে কৃপণ বুড়ো সে ঘড়াটার মুখ বন্ধ করে দিল। 'আমি জমালাম সোনা, রুপো আর এখন দেখছি এ কোন এক কুরবানের হয়ে গেল! তা হতেই পারে না।'

আবার ঘড়াদুটোকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে বেড়ার কাছে বসে ভাবতে লাগল: 'আমার ধন কোন এক কুরবানের হাতে চলে যেতে চায়! আমাদের পাড়াতেই তো থাকে স্যাঁকরা কুরবান। আমার ধন যেতে চায় স্যাঁকরার কাছে?! এ ধন জমিয়েছি আমি, এ আমি অন্য কারুর হাতে পড়তে দেব না!'

ছুটে বাড়ীতে গিয়ে কুড়ুল আর দড়ি নিয়ে এসে নিজের গাধায় চড়ে গেল পাহাড়ের

দিকে। সেখানে একটা গাছ কেটে, তার গুঁড়ির দুটো বড় টুকরো কেটে নিয়ে গাধার পিঠে করে নিয়ে এল বাড়ীতে।

বাড়ীতে গুঁড়ির কাটা টুকরোগুলোতে গর্ত করল। তারপর মাটি খুঁড়ে সোনারুপোর মোহরভরা ঘড়াগুলো তুলে এনে একটা কাটা গুঁড়ির গর্তের মধ্যে ঢালল সোনার মোহরগুলো, অন্য কাটা গুঁড়ির গর্তের মধ্যে ঢালল রুপোর মোহর। তারপর গর্তগুলোর মুখ কাঠের টুকরোটাকরা গুঁড়ো দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করে দিল যে কোনো ফাঁকই রইল না আর।

তখনি সে কাটা গুঁড়িগুলোকে গাধার পিঠে করে নিয়ে চলল নদীর কাছে, ছুঁড়ে সেগুলোকে ফেলে দিল নদীতে।

'দেখব এবার কেমন করে তোমরা কুরবানের হও !'

সারারাত ঘুমোতে পারে না কিপটে, ভাবে: 'হায়, এ আমি কি করলাম ! এতদিন ধরে অর্থ জমিয়ে জমিয়ে শেষে কিনা নিজেই তা ফেলে দিলাম নদীতে ! আর এখন দুঃখে হতাশায় চোখ বুজতে পারছি না !'

ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ করামাত্রই সে চলল নদীর তীর বরাবর নিজের সেই গুঁড়ির টুকরোগুলোর খোঁজে। নদীর এপার ওপারে চোখ চালিয়ে দেখতে লাগল যদি কোন কিছুতে আটকে লেগে থাকে সেগুলো। কিন্তু কোথাও কিছুই দেখা যায় না।

এমনিভাবে নিজের মোহরগুলো খুঁজতে খুঁজতে নদীর তীর বরাবর যেতে যেতে সে পৌঁছে গেল প্রতিবেশী শহরে।

সেই শহরে ছিল এক ধনী লোক কাসিম। নদীতীরে সে দাঁড় করিয়ে রাখত দু'জন কর্মচারীকে যারা নদীতে ভেসে গাছ, গুঁড়ি কাঠ সব তুলে নিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলায় সেই কাঠগুলো গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসত কাসিমের বাড়ীতে।

কাসিমের কর্মচারীরা একদিন দেখল আর্চা গাছের কাটা দুটো গুঁড়ি ভেসে আসছে, সেগুলোও তুলে নিল তারা।

সেই শহরে বাস করত এক গরীব কামার কুরবান। সে কাঠ কিনত কাসিমবাইয়ের কাছে, কাঠ কিনে কিনে সে অনেক ধার করে ফেলেছে তার কাছে, কিছুতেই সে ধার মিটিয়ে দিতে পারে না।

সে দিন যখন কাসিমবাইয়ের কর্মচারীরা আর্চা গাছের কাটা গুঁড়িগুলো নিয়ে এল তখন কাসিম কামারকে ডেকে বলল:

'যদি ধার শোধ করতে না পারিস তাহলে খেটে দে তার বদলে। এখন আমার বাড়ীতে গিয়ে কাঠ নিয়ে পুড়িয়ে কাঠ কয়লা করে দে।'

কাসিমবাইয়ের বাড়ীর উঠোনে এসে কুরবানের চোখে প্রথমেই পড়ল আর্চা গাছের কাটা টুকরোদুটো।

'এগুলো দিয়ে খুব ভাল কাঠকয়লা হবে। আর্চা থেকে সবচেয়ে ভাল কাঠকয়লা হয়।' বলে সে কাঠগুলো নিয়ে চাপাতে লাগল হাতগাড়ীতে।

কাঠগুলো নিজের কামারশালায় এনে চুলার সামনে রাখল কুরবান। এবার সেগুলোকে টুকরো করে পুড়িয়ে কয়লা করতে হবে।

'আর্চা দিয়েই আরম্ভ করা যাক।' বলে কুরবান কুড়ুল নিয়ে কোপ বসাল একটা আর্চার গুঁড়ির টুকরোয়। গুঁড়িটা দুফাঁক হয়ে গেল আর তার থেকে ঝরঝর করে পড়তে লাগল রুপোর মোহর।

'আরে, আরে, ও বউ!' নীচু স্বরে ডাকল কুরবান। 'শীগগির এদিকে এসো তো আর একটা বাটি নিও সঙ্গে!'

কামারবউ একটা বাটি হাতে নিয়ে ছুটে এসে রুপোর মোহরের ছড়াছড়ি দেখে তাড়াতাড়ি কুড়োতে লাগল সেগুলো, আধবাটি হল রুপোর মোহর।

'বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখ মোহরগুলো!' বলল কামার বৌকে। 'এবার কাসিমবাইয়ের সব দেনা মিটিয়ে দিতে পারব।'

খুশীমনে কুরবান এবার অন্য গুঁড়িটায় কোপ বসাল, মুখ দিয়ে তার এক চীৎকার বেরিয়ে এল।

'ও বউ শীগগির এস! আর একটা বাটি নিয়ে এস!'

'ভাগ্য দেখছি সদয় হয়েছে আমাদের উপর, এবার ছেলেপিলেগুলো পেটভরে খেতে পাবে।' সোনার মোহরগুলো বাটিতে কুড়িয়ে নিতে নিতে বলতে লাগল কামারবউ।

'কালই বাইয়ের দেনা মিটিয়ে দিয়ে বাজারে যাব। কিনব চাল, ঘি, মাংস, বাচ্চাদের জন্য মিষ্টিখাবার, সবার জন্য কিনব জামাজুতো, আর সবচেয়ে বড় কথা — কিনব হাতুড়ি — নেহাই, নতুন করে নেব কামারশালাকে। তখনই আমার কাজ ভাল চলবে, বেশ ভালোভাবে থাকতে পারব তখন আমি!' বউকে বলতে লাগল কুরবান।

কয়েকদিন বাদে সন্ধ্যাবেলায় ঐ শহরে এসে পেঁছাল সোনারুপোর মোহরগুলির মালিক — সেই কৃপণলোকটি। শহরের শুরুতেই সে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করল:

'কোথায় আজকের রাতটা কাটান যায় সে কথা বলতে পার নাকি?'

'যে কোন বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দাও, পথিককে কেউ ফিরিয়ে দেবে না।' কৃপণ লোকটি এক বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল।

'সালাম! আজ রাতটা কাটান যাবে নাকি এ বাড়ীতে?' দরজা খুলে দাঁড়ান কামার কুরবানকে বলল সে।

'নিশ্চয়ই, এস, এস আমার অতিথি হও!' বলল কুরবান।

অতিথিকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বউকে কামার বলল অতিথির জন্য খাবার আয়োজন করতে।

'এবার বল তো দেখি কোথা হতে আসছ তুমি আর যাচ্ছই বা কোথায়?' অতিথিকে খেতে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল কুরবান।

'এমন এক কাণ্ড করে বসেছি যে বলতেও লজ্জা করে। তুমি দেখছি ভালমানুষ, মনটা দয়ায় ভরা, তোমায় বলি আমার গোপন কথা...'

অতিথি গৃহকর্তাকে বলল সেসব কথা যা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। সে গল্প শুনে অভিভূত হয়ে কুরবান মাথা নীচু করে বসে রইল নীরবে।

অতিথি ঘুমে ঢলে পড়লে সে অন্যঘরে গেল, যেখানে তার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, ফিসফিস করে বউকে বলল:

'রূপোসোনার মালিককে পাওয়া গেছে। ওগুলো তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে আমাদের। কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যেন সে বুঝতে না পারে যে কিছু সোনারূপোর মোহর খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু কেমন করে তা করা যায় ?'

'আমি আটা মাখব আর ভোর হবার মুখে দুটো বড় রুটি তৈয়ারী করব। তার একটার মধ্যে সোনার মোহর ভরে দেব, আর অন্যটার মধ্যে রূপোর মোহর ভরে দেব।' বলল কামারবৌ। 'সকালে অতিথি যখন যেতে চাইবে তখন ওকে ঐ রুটিদুটো দেব পথে খাবার জন্য। তাতেই মোহরগুলো ফেরতে পাবে ও।'

সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে অতিথি যখন বিদায় নিতে চাইল তখন গৃহকর্তা অতিথিকে বলল: 'এই রুটিদুটো নাও, পথে খিদে পেলে খেও।'

এমন দয়ালু গৃহকর্তার হাত থেকে রুটিদুটো নিয়ে অতিথি প্রতিটিতে তিনবার করে চুমো দিয়ে রুমালে মুড়ে রেখে দিল।

'এমন আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞ আমি। এবার বাড়ীর পথ ধরব আমি। এমন স্রোতস্বিনী নদীর বেগের সঙ্গে পেরে উঠব কেন আমি !' বলে কৃপণ লোকটি কুরবানের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

শহরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ তার জুতোটা গেল ছিঁড়ে। এক মুচীর কাছ গিয়ে সে বলল: 'জুতোটা ছিঁড়ে গেল আমার, কিন্তু জুতো সারানর বদলে দেবার মত পয়সা নেই আমার। একটা রুটির বদলে জুতোটা সারিয়ে দাও না গো !'

'ঠিক আছে, দাও রুটিটা, খোল জুতো, সারিয়ে দেব।' বলল মুচী।

কৃপণ জুতোটা খুলে দিল মুচীকে। তারপর রুটীর মোড়কটা খুলতে লাগল।

মুচী ছুঁচে মোটা সুতো পরিয়ে জুতোটা সেলাই করতে গেল, ছুঁচটা মট করে ভেঙে গেল, আর একটা ছুঁচ নিল মুচী, সেটাও ভেঙে গেল মট করে, এমনি করে পরপর চারটে ছুঁচ ভাঙল সে।

'কি জুতোর ছিরি !' বলল মুচী। 'কখনও এমনি করে ছুঁচ ভাঙি নি আর এখন একেবারে চারটে পরপর ! আর ছুঁচ নেই আমার, তুমি ওখানে বসে থাক, আমি একছুটে কামারের কাছে থেকে আসছি।'

ভাঙা ছুঁচগুলো নিয়ে চলে যাবার সময় মুচী বলল: 'পয়সা নেই আমার, আজ এখনও কামাই নি কিছু, তোমার দেওয়া রুটিটাই কামারকে দিতে হবে দেখছি।' বলে পথিকের কাছে পাওয়া রুটিটা হাতে নিল।

'হয়ত একটায় হবে না, নাও, এটাও নাও।' বলে কৃপণ মুচীর হাতে অন্য রুটিটাও তুলে দিল।

রুটিগুলো পোশাকের মধ্যে ঢেকে নিয়ে মুচী গেল কুরবান কামারের কাছে। কুরবান তাকে চারটে নতুন ছুঁচ করে দিল।

'রাগ কোরো না, ভাই, আজ এখনও পয়সা কামাই নি, আমি এই কাজের বদলে পেয়েছি আগাম যে রুটিদুটো সেগুলোই তোমায় দেব।'

মুচী কামারকে রুটীগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় কুরবান বাড়ী এসে রোজগার করা রুটীদুটো তুলে দিল বউয়ের হাতে, বউ বলে উঠল:

'আরে এ যে আমার করা রুটিগুলোই।' বলে ভাঙল সেগুলোকে।

একটা থেকে ঝরে পড়ল সোনার মোহর, অন্যটা থেকে পড়ল রুপোর মোহর।

'হায়-হায়-হায়! কি যে করি এখন? অন্যের ধন ভোগ করতে চাই না আমি!' হতাশ হয়ে বলল কুরবান।

'এখন তুমি এর মালিককে খুঁজে পাবে কি করে? কতক্ষণ আগেই চলে গেছে আমাদের অতিথি, আমরা এমন কি জানিও না কোনদিকে গেছে সে।' বলল কামারবৌ। 'তুমিই তাহলে সেই কুরবান, যার হাতে পড়তে চেয়েছিল এই ধন, তাই জন্যই তোমায় এ ধন ছেড়ে যেতে চাইছে না।'

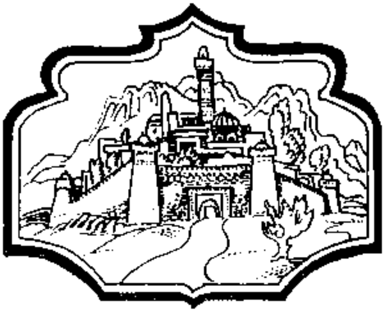

সোনার চাষ

একবার বুখারার চোর ধরতে গিয়ে ধরা হল একজন নিরপরাধী লোককে।

'ফাঁসি দাও এই চোরটাকে।' বলল বাদশাহ।

'হায়! এখন আর কেউ সে কাজ করতে পারবে না, যা আমি পারি।' বলে উঠল লোকটা।

'কিসের কথা বলছিস তুই। কি করতে পারিস তুই?' জিজ্ঞাসা করা হল তাকে।

'আমি সোনার চাষ করতে পারি।' বলল লোকটা।

ফাঁসি স্থগিত রেখে ছুটল সবাই বাদশাহ্‌র কাছে।

'হুজুর, যে লোকটাকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, সে সোনার চাষ করতে জানে।' বাদশাহ লোকটাকে নিয়ে আসতে আদেশ দিল।

'যদি তুই সোনার চাষ করতে জানিস তো সোনাচাষ কর আমার জন্য, তার বদলে তোর জীবন ফিরিয়ে দেব আমি।' বলল বাদশাহ।

রাজী হল লোকটি। জমিতে লাঙল দিয়ে তৈরী করে সোনা চাইল সে জমিতে পোঁতার জন্য।

বাদশাহ্‌র ভান্ডার থেকে পাঁচমণ সোনা আনা হল পোঁতার জন্য। বাদশাহ নিজে তার উজীরদের নিয়ে দেখতে লাগল কেমন করে সোনা পোঁতা হয়।

'বীজ পোঁতার জন্য তৈরী হয়েছে জমি।' বলল লোকটি। 'এবার ঠিক করতে হয় কে পুঁতবে সোনার বীজ। সোনা পুঁততে পারে একমাত্র সৎলোক, যে জীবনে কখনও কারুর থেকে কোন কিছু চুরি করে নি। আমি কখনও চুরি করি নি, কিন্তু চুরির দোষ চাপান হয়েছে আমার ঘাড়ে তাই আমি সোনা পুঁততে পারব না।'

'আমার প্রধান উজীর পুঁতুক।' বলল বাদশাহ।

'না, না, মালিক, আমি একেবারেই উপযুক্ত নয় এ কাজের জন্য!' ব্যস্ত হয়ে প্রতিবদ জানাল উজীর।

'তাহলে আপনি পুঁতুন, প্রধান কাজী।' বলল বাদশাহ।

'আমি... আমিও, উপযুক্ত নই।' তুতলিয়ে বলল কাজী।

বাদশাহ চোখ ফেরাল নিজের হাকিমের দিকে।

হাকিমের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, মাথা নাড়িয়ে বলল:

'মাফ করবেন, হুজুর, আমিও এর উপযুক্ত নই...'

'আপনি এদিকে আসুন মোল্লাসাহেব!' মোল্লাকে ডাকল বাদশাহ।

'না না, মালিক আমিও পাপী...'

নিজের পারিষদদের সবাইকে জিজ্ঞাস করল বাদশাহ। কেউই সোনা পুঁততে চাইল না।

'তাহলে, শাহ্‌নশাহ, আপনাকে নিজেকেই পুঁততে হবে সোনা।' বলল দণ্ডিত লোকটি।

'ভাবছি, আমি সব নষ্ট করে ফেলব না তো।' ইতস্তত করে বলল বাদশাহ।

'হুজুর! এই তাহলে ব্যাপার!' চীৎকার করে উঠল লোকটি। 'আপনার দরবারে একজন সৎ লোকও নেই? আমি তো সারাজীবনে কানাকড়িও চুরি করি নি আর আপনি আমাকে চোরের মত ফাঁসি দিতে আদেশ দিয়েছেন!'

নতুন শহর নাভোবদ

এক দেশে ছিল এক দয়ালু ন্যায়পরায়ণ লোক। লোকটি খুব ভাল জানত মালীর কাজ, এক চমৎকার বড় বাগান তৈরী করেছে সে নিজের জন্য। যখন তার বয়স হল নিজে আর খাটতে পারে না তখন নিজের ছেলে হামদামের হাতে তুলে দিল দেখাশোনার ভার। বাবার থেকে হামদামও পেয়েছে দয়ালু আর ন্যায়পরায়ণ চরিত্র আর সেই সঙ্গে ফুল-গাছপালার প্রতি ভালবাসা।

বিয়ে করেছে হামদাম, দুটি অতি সুন্দর ছেলে তার।

মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে একদিন তার বাবা ছেলেকে ডেকে পাঠাল, বন্ধু আর প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বলল ছেলেকে: 'বাপ হামদাম।' আমি মরে গেল যে কাজ আমি আরম্ভ করেছি তা তুই চালিয়ে যাবি... সৎভাবে পরিশ্রম করবি, দয়ালু আর ন্যায়পরায়ণ হবি, কখনও অন্যের জিনিস দখল করার চেষ্টা করিস না। এই হল তোকে আমার উপদেশ। যতদূর মনে পড়ে কখনও অন্যের জিনিস নিই নি আমি আর কারুর কাছে কিছু ধারি না। কিন্তু মানুষের ভুলে হতে পারে, হয়ত আমি কারুর কাছে কিছু নিয়েছি ফিরত দিতে ভুলে গিয়েছি... যদি কেউ তোকে বলে আমার দেনা মিটিয়ে দিতে তো অস্বীকার করে আমার মুখে কালি দিস না, পরপারে আমার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাস না।' একথা বলে চুপ করে গেল বুড়ো।

'হামদাম, তোর বাবা যা বলল মনে রাখিস। বিশেষ করে শেষের কথাগুলি।' বলল তাদের প্রতিবেশী ব্যাবসায়ী।

সেই রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল হামদামের বুড়ো বাবা। খুব ভালভাবেই বাবার শেষ কাজ করল হামদাম, কাঁদলও খুব।

বাবা তাকে যেমনটি হতে বলেছিল ঠিক তেমনটি হতেই চেষ্টা করে সে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে নিজের বাগানে, অতিথি পরায়ণ সে, আর সাহায্য করে সবাইকেই যার আশ্রয় বা কোন সাহায্যের দরকার।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় তার কাছে বাগানে এল প্রতিবেশী ব্যবসায়ী যে শুনেছিল তার বাবার শেষ কথাগুলি।

'এই যে হামদাম। তোর কাছে এলাম একটা দরকারে।' বলল সে। 'তোর পরলোকগত বাবা আমার কাছে টাকা ধার করেছিল। বলেছিল কিছুদিন বাদেই ফিরত দেবে, বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। এতদিন কাটল। আমি তোকে এতদিন একথা মনে করিয়ে দিই নি, ভেবেছিলাম তুই নিজেই তোর বাবার দেনা শোধ করে দিবি। তোর বাবা তোকে কি এ দেনার কথা বলে নি ?'

'না... বাবা তো আমাকে কিছু বলে নি।' বলল হামদাম অবাক হয়ে। 'কত টাকা নিয়েছিলেন বাবা আপনার কাছে ?'

'পাঁচশ টাকা।'

'একটু অপেক্ষা করুন এখানে।' ব্যবসায়ীকে বলে হামদাম বাড়ীর মধ্যে গিয়ে টাকা নিয়ে এসে দিল তার হাতে।

'এবার তোর বাপ শান্তিতে ঘুমোতে পারবে কবরে শুয়ে — ছেলে তার নাম ডোবায় নি।'

কয়েকদিন বাদে হামদামের কাছে এল গ্রামের জমিদার। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল যেন কথা আরম্ভ করতে ভরসা পাচ্ছে না, শেষে অর্থপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করল:

'হামদাম, তোর বাবা মরার আগে তোকে কিছু বলে যায় নি ধারদেনার কথা ?'

'না... কেন বলুন তো ?'

'আমার কাছে দানাশস্য নিয়েছিল সে। প্রথমে তোর বিয়ের সময় নেয় দশকাঠা গম। আমি তাকে মনে করিয়ে দিই নি সে দেনার কথা, সেও আর ফিরত দেয় নি... তারপর তোর ছেলেদের জন্মের সময় আবার নেয় বারো কাঠা গম আর পাঁচকাঠা চাল।

'আশ্চর্য, এতখানি ধার করে বাবা আমায় কিছু বলেন নি তো ?' অবাক হল হামদাম।

'ভুল হয় তো মানুষমাত্রেরই।' বলল জমিদারটি।

কি বলবে ভেবে পেল না হামদাম। মৃত্যুর পূর্বে বাবা যে উপদেশ দিয়েছিল তা মনে পড়ল, 'দেনা' মিটিয়ে দিতে হল তাকে।

কিন্তু বাবার 'দেনা' মিটোতে গিয়ে বাগানের খানিকটা অংশ বেচে দিতে হল তাকে।

এই দেনা মিটোবার পরেও হামদামের কাছে আরও আসতে লাগল অনেক, বাবার দেনা শোধ করার দাবী করতে লাগল। এখন আর হামদামের বাগানে কাজ করার সময় হয় না মোটেই। বাবার মৃত্যুর পরে যা কিছু তার হাতে এসেছিল সে সবই ক্রমে ক্রমে বেচে দিতে হল,

শেষে পরিবারকে নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও আর রইল না। এবার বাবার বন্ধু ও পরিচিতরা আর তাদের কাছে আসে না।

'এখানেই আমাদের জন্ম হয়েছে, আর এখানে এখন ভিখারীর মত থাকতে লজ্জা করে।' হামদামের বউ বলল। 'সব বন্ধুরা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সাহায্য করতে চায় না কেউ। তার চেয়ে চল, ছেলেদের নিয়ে চলে যাই অন্য কোন দেশে—সেখানে কেউ আমাদের জানবে না আর যদি আমরা নিঃস্বজীবন যাপন করি তো কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

কয়েকদিন বাদে হামদাম তার বউ, ছেলেদের নিয়ে শহর ছেড়ে গেল।

অনেক মাঠ মরুভূমি পেরিয়ে শেষে তারা এসে পেঁছাল সমুদ্রতীরে। জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জাহাজের মালিককে হামদাম অনুরোধ করল তাদেরকে দূরে কোন দেশে পেঁছে দিতে বলল যে তারা এর বদলে একটি পয়সাও দিতে পারবে না।

রাতের বেলায় সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠল, যে জাহাজে হামদাম তার বউছেলে নিয়ে উঠেছিল সেটা ডুবে গেল। অনেক যাত্রী ডুবে মরল আর কিছু লোক জাহাজের ভাঙা কাঠ-মাস্তুল প্রভৃতি আঁকড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে লাগল।

এমনিভাবে কয়েকদিন ও রাত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলল হামদাম। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় সে প্রায় সংজ্ঞাহীন কিন্তু যে তক্তাটা ধরে সে ভাসছে সেটা ছাড়ছে না।

ঝড় আস্তে আস্তে কমে গেল। তক্তাটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ক্লান্ত হামদাম ঘুমে ঢলে পড়ল। তীরের কাছে ভেসে এল তক্তাটা, তীরে যখন ধাক্কা খেল তক্তাটা তখন চোখ মেলে সে দেখল সেটা এক প্রান্তহীন, ন্যাড়া মরুভূমি। মনে হল যেন সেখানে কখনও কোন মানুষ বা জন্তুর পা পড়ে নি বা কোন পাখীও উড়ে যায় নি।

তীরের কাছে একটা ছোট গাছ দেখতে পেয়ে হামদাম অতি কষ্টে সেটার কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু গাছটায় ফল বা পাতা কিছুই নেই। শুকিয়ে গেছে গাছটা, হতাশ হয়ে গেল।

দুর্বল, নির্জীব হামদাম সেই গাছের নীচে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখল তার স্ত্রী আর দুই ছেলেকেই। তারা কাঁদছে আর হামদামকে ডাকছে, কিন্তু ভয়ংকর সামুদ্রিক জন্তু তাদের আটকে রেখেছে আসতে দিচ্ছে না। তারপর হঠাৎ সে সব কিছু মিলিয়ে গেল আর মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হলুদ পোশাক পরা এক বুড়ো তার কাছে এগিয়ে এসে বলল: 'শোন হে আগন্তুক। কপালদোষে তুমি এসে পড়েছ এই মরুভূমিতে। কিন্তু তুমি দুঃখ কোরো না, হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। এই দেশ তোমার। পরিশ্রম করে এই মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করে তোল। সমুদ্রের কাছে, জলে হাত ডুবিয়ে যা হাতে ঠেকে তা তুলে আন। আর সাহায্যেই তুমি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে।'

চলে গেল বুড়ো, ঘুম ভেঙে গেল হামদামেরও, দেখে তার কাছেই সিংহের পায়ের ছাপ।

সমুদ্রের কাছে গিয়ে সে জলে হাত ডোবাল যা হাতে ঠেকল তাই ধরল, তুলে দেখে

সামুদ্রিক ঘাসলতা আর বিভিন্ন রঙীন পাথর। সমুদ্রের জল থেকে সে ঘাসলতা আর রঙীন পাথর তুলেই চলল যতক্ষণে না ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। তখন সে বিশ্রাম নেবার জন্য ফিরে গেল গাছটার কাছে, দেখে গাছে একটা সবুজ ডাল গজিয়েছে আর তাতে ঝুলছে একটা ফল। ফলটা ছিঁড়ে নিয়ে হামদাম ক্ষুধা মিটিয়ে, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েকদিনের পরিশ্রমে হামদাম সমুদ্র থেকে তুলল সেই অপূর্ব, ঝলমলে পাথরের একটা গাদা। রাতের বেলায় সে পাথরগুলি থেকে এমন আলো ঝলকায় যে মরুভূমিটা আলোকিত হয়ে ওঠে।

সমুদ্রতীর থেকে বেশ দূরে সেই মরুভূমির মধ্য দিয়েই চলে গেছে কারাভান যাবার পথ। মরুভূমির মধ্যে আলোর ঝলক দেখে অবাক হচ্ছিল কারাভানের লোকেরা, কয়েকজন সাহস করে দেখতে গেল কিসের থেকে অমন ঝলক বেরোচ্ছে দেখার জন্য।

সমুদ্রের তীরের কাছে এসে তারা দেখতে পেল গাছের নীচে একটা লোক বসে আছে আর খানিক দূরে অপূর্ব ঝকমকে পাথরের একটা গাদা।

'কে তুমি — মানুষ না ডাইন?' হামদামকে জিজ্ঞাসা করল তারা। 'এই অপূর্ব পাথরগুলো কোথায় পেলে তুমি?'

'আমি মানুষ। ঝড়ে আমাকে একাকে এখানে এই সমুদ্রতীরের মরুভূমিতে এনে ফেলেছে। আর এই মণিমাণিক্যগুলি আমি নিজের হাতে তুলেছি।'

'ওগুলো তুমি আমাদের কাছে বেচবে?'

'বেচব, কিন্তু অর্থের বদলে নয়। তোমরা আমাকে এনে দেবে শস্যবীজ, ঘাস, ফুল, ফলের গাছের বীজ আর যা কিছু মানুষের বাঁচার জন্য দরকার।'

রাজী হল ব্যবসায়ীরা, তারা প্রত্যেকে হামদামের কাছে থেকে নিল এক থলি করে মণিমাণিক্য। খুশী ব্যবসায়ীরা চলল নিজেদের পথ ধরে, বলতে লাগল সবাইকে এমন চমৎকার লেন-দেনের কথা।

কিছুদিন বাদেই ব্যবসায়ীরা ফেরার পথে হামদামের জন্য নিয়ে এল পণ্য তার বদলে পেল মণিমাণিক্য।

ক্রমশঃ ন্যাড়া জমির ওপর গজিয়ে উঠল বাগান, সুন্দর সুন্দর বাড়ী। মাথা তুলল একটা গোটা শহর। শহরের মাঝে একটা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ। প্রাসাদের দেওয়ালগুলি মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত। প্রাসাদটা সূর্যের মত ঝলক ছড়ায়, দূর সমুদ্রের থেকেও দেখা যায় প্রাসাদটা।

যে-ই সে শহরে আসে তাকেই হামদাম বলে:

'গরীব, বিধবা, গৃহহীন যারাই আছে তারা যেন আসে তার নতুন শহরে, আমার সঙ্গে মিল কাজ করে। এখানে তারা অভাব, দুঃখ কিছু জানবে না।

হামদাম সেই নতুন শহরের শাসক হল। আর সেই গাছটা যেটার নীচে হামদাম বিশ্রাম নিয়েছিল যখন সমুদ্রে ভেসে সে এসে পড়েছিল শূন্য তীরভূমিতে, তাকে ঘিরে এখন গজিয়ে

উঠেছে একটা বড় বাগান আর গাছটা ভরে গেছে ফলে পাতায়। সে গাছটার দিকে তাকিয়ে হামদামের প্রায়ই মনে পড়ে তার আগের বাগান, বাড়ীর কথা, পরিবারের কথা, যে পরিবার সমুদ্রে ডুবে মরেছে বলে তার ধারণা।

নতুন শহরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, বিভিন্ন দেশ থেকে লোক দেখতে আসতে লাগল।

একবার এক সওদাগর তার পাতানো বোনকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে এসে পেঁছাল শহরে। সন্ধ্যাবেলায় সওদাগর হামদামের কাছে গেল আর যাবার সময় নিজের বোনের ঘরের কাছে প্রহরা বসাতে বলল।

দু'জন যুবক প্রহরী সে ঘরের সামনে মুখোমুখি বসে পাহারা দিতে লাগল। তারা পরস্পরকে জানে না তাই প্রথমে কথা বলছিল না পরস্পরের সঙ্গে।

কিন্তু তারপরে তাদের একজন বলল: 'সারারাত কথা না বলে বসে থাকতে বিরক্তি ধরে যাবে। বল কিছু শুনি!'

'মনে হচ্ছে, তুমি আমার চেয়ে সামান্য বড়ই হবে। তুমি কিছু বল শুনি।'

'ঠিক আছে, আমি বলব আমার নিজের কথা। আমার এক ভাই ছিল, আমার চেয়ে ছোট। আমাদের বাবামার অবস্থা পড়ে গেল, তাই আমরা সবাই নিজের শহর ছেড়ে চলে গেলাম। মনে আছে আমরা একটা জাহাজে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। রাতে ঝড় উঠল, আমাদের জাহাজ ডুবে গেল। বেশীর ভাগ লোকই ডুবে মরল। সেই একই দশা হল, বোধহয়, আমার বাবামা আর ভাইয়েরাও। আমি তীরে এসে পড়েছিলাম। একজন দয়ালু লোক আমাকে নিয়ে যান নিজের কাছে, কয়েকবছর কাজ করি তাঁর কাছে। তারপর যখন এই নতুন শহরের কথা শুনলাম, তো ভাবলাম এখানে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব। এ শহরের শাসক ভালো, পিতার মত স্নেহপরায়ণ, আর তাঁর নামও হামদাম আমার বাবার নামও তাই ছিল।'

'তোমার নাম কি?' অবাক হয়ে অন্য প্রহরীটি জিজ্ঞাসা করল।

'আমার নাম রফি।'

'আর তোমার ভাইয়ের নাম কি ছিল?'

'হাফিজ!'

'ভাই রফি! আমি হাফিজ — তোমার ভাই!'

এমনিভাবে তারা পরস্পরকে খুঁজে পেল।

দুই ভাইয়ের কথাবার্তা ঘরের মধ্যে থেকে শুনতে পেয়েছিল সওদাগরের পাতানো বোন, চোখের জলে বুক ভাসতে লাগল তার। কিন্তু প্রহরীরা তার সে কান্নার কথা জানল না কিছু।

পরের দিন সকালে সওদাগর এল পাতানো বোনের কাছে তাকে নিয়ে শহর দেখাতে যাবার জন্য।

'তোর চোখে জল কেন?' জিজ্ঞাসা করল সে বোনকে।

'তার কারণ আমার প্রহরীরা।' বলল বোন।

সওদাগর রেগে গিয়ে হামদামের কাছে অভিযোগ জানাল। হামদাম অবিলম্বে প্রহরীদের ডেকে পাঠাতে আদেশ দিল।

'শপথ করে বলছি আমরা এই মহিলার কোনো অপমান করি নি। সারারাত আমরা ওঁর দরজার কাছে বসে কেবল বলেছি নিজেদের কথা।' বলল রফি ও হাফিজ।

'ডাকা হোক মহিলাটিকে আর তাঁর উপস্থিতিতে বলবে যা তোমরা বলেছ রাতের বেলায়।' বলল হামদাম।

রফি মহিলাটির উপস্থিতিতে বলল সেইসব কথা যা সে বলেছিল রাতের বেলায়।

'ওরে আমার বাছারা! আমিই তোদের বাবা।' বলে হামদাম দুই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

তখন মহিলাটি মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে বলে উঠল:

'ওরে আমার বাছারা! আমার স্বামী গো!'

হামদাম চিনতে পারল নিজের স্ত্রীকে। তাদের চারজনেরই আনন্দের আর সীমা রইল না।

এমনি করেই সেই অপূর্ব শহরে হামদামের জীবনে সুখ ফিরে এল।

তীরন্দাজ আর তার বন্ধুরা

অনেক অনেকদিন আগে ছিল এক শিকারী — এক নিপুণ তীরন্দাজ। শিকার গিয়ে খালি হাতে ফিরত না সে কখনও।

একদিন সে অনেক জীবজন্তু শিকার করে নিয়ে ফিরছিল, পথে দেখা হল তার এক গরীব চাষীর সঙ্গে।

'ভাল শিকার করেছ হে, তীরন্দাজ। বেশ ভাল দামে বেচতে পারবে তোমার আজকের শিকার।'

তীরন্দাজ গরীব চাষীকে লক্ষ্য করে বলল:

'লক্ষ্য স্থির করা আর হাতের তীর ছোঁড়ার নিপুণতারই হল আসলে দাম। এই পাখীটার দাম অন্যের কাছে কি পাব জানি না, কিন্তু তোমায় এটা খুব শস্তায় দিয়ে দেব। এর জন্য যা দেওয়া কুলোয় তোমার ক্ষমতায় তা-ই দেবে।'

'শোন গো ভালমানুষের ছেলে, আমার কি পাখী কেনার সামর্থ্য আছে? খাজনা দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম। ঘরেদোরে আর কোনো কিছুই নেই, পড়ে আছে কেবল একটি ঘোড়া। একমুঠো আটা আর জল — এই আমাদের সারাদিনের আহার। নতুন ফসল তোলা পর্যন্ত বাঁচব কি করে জানি না।'

'ঠিক আছে, তোকে এটা এমনিই দিলাম, দাম দিতে হবে না। আনন্দ করে খাস।' বলল তীরন্দাজ।

চাষী তার কাছ থেকে পাখীটা নিয়ে বলল:

'তোমার দয়ার কথা কখনও ভুলব না ভালোমানুষের ছেলে। এখন থেকে তুমি আমাকে

নিজের বন্ধু বলে মনে করবে। যখনি তুমি আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবে অবশ্যই এসো, আমাদের প্রিয় অতিথি হবে।'

'আচ্ছা!' বলে তীরন্দাজ নিজের বাড়ীর পথ ধরল।

কয়েকদিন বাদে আবার শিকারে গেছে তীরন্দাজ। বিভিন্ন ধরণের অনেক পাখী মেরে বাড়ী ফিরছে! হঠাৎ দেখে পথের শুয়ে আছে এক থুরথুরে বুড়ো।

'কি হল গো চাচা?' জিজ্ঞাসা করল তীরন্দাজ।

'আর কি বাপ, বুড়ো হয়েছি, রোগে ধরেছে। সারাজীবন বাদশাহের প্রাসাদে কাজ করেছি আর এখন ক্ষমতা নেই কাজ করার। কেউ দেখে না আমায়, খাবার কিছু নেই আমার।'

'এইগুলো নাও তুমি। এসব আমি শিকার করেছি।' বলল তীরন্দাজ।

'না রে বাপ, এ আমি নিতে পারব না, এর দাম অনেক!' বলল বুড়ো।

'দাম কেবল লক্ষ্য স্থির করার আর হাতের তীর ছোঁড়ার। আর পাখী শিকার করেছি আমি খুব সহজেই। নাও এগুলো বেশ কিছুদিন চলে যাবে তোমার এতে।' বলে তীরন্দাজ বুড়োর সামনে শিকার করা সব পাখীগুলো রেখে দিল।

বুড়ো তীরন্দাজের এই আচরণে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলল আর বলল:

'যতদিন আমি বেঁচে আছি আমাকে তোমার বন্ধু মনে কোরো। যখনি আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবে অবশ্য এসো, তোমাকে ছেলের আদরে গ্রহণ করব।'

'ধন্যবাদ!' বলে তীরন্দাজ বাড়ীর পথ ধরল।

কয়েকদিন বাদে তীরন্দাজ আবার শিকারে গিয়ে অনেক পাখী মারল। ফেরার পথে সে দেখে একটা বাড়ীর খোলা ফটকের কাছে মাটিতে দাগ কেটে গোল করে বেড় আঁকা, সেই বেড়ের ভিতরে বসে আছে একজন লোক।

'এমনি করে বসে আছিস কেন? কি দোষ করেছিস?' জিজ্ঞাসা করল তীরন্দাজ।

'ধার করেছিলাম এই ধনীর কাছে, কিন্তু সে ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। তাই সে আমাকে এই বেড়ের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে, বলেছে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ আমার হয়ে সে ধার মিটিয়ে দিতে না পারে তো কাল থেকে আমি ঐ ধনীর ক্রীতদাস হব। কে-ই বা সে ধার মিটিয়ে দিতে পারবে আমার হয়ে? ধনী আত্মীয়স্বজন নেই তো আমার। কাল থেকে ক্রীতদাস হব।' বলল গরীব লোকটি।

'না তা হবে না।' বলল তীরন্দাজ। 'এই নাও আমার শিকার, ঐ ধনী লোকটিকে দাও গিয়ে — সে তোমায় ছেড়ে দেবে।'

গরীব লোকটি চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল তীরন্দাজের দিকে। তীরন্দাজ ওদিকে সব মরা পাখীগুলো কাঁধ থেকে নামিয়ে গরীব লোকটির সামনে রাখতে আরম্ভ করেছে।

গরীব লোকটি বলল: 'তুমি, বন্ধু, বাঁচালে আমায়। তোমার কাছে ঋণী রইলাম আমি। ঐ যে আমার বাড়ী, যখন ইচ্ছা হবে এসো। আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন যাবে যদি না ঢোকো আমার বাড়ী তো খুব রাগ করব। আজ থেকে আমাকে তোমার বন্ধু মনে করবে।'

'ঠিক আছে, আসব'খন।' বলে তীরন্দাজ বাড়ীর পথ ধরল।

কিছু দিন বাদে আবার শিকারে গেল তীরন্দাজ। সেদিন অনেকক্ষণ ধরে বনের মাঝে ঘুরেও কোনো কিছু শিকার করতে পারল না সে। হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে মনস্থ করল সে।

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে বাদশাহ বনে এসেছে শিকারে। একটা জন্তুর পিছনে তাড়া করছে বাদশাহ, তীর ছুঁড়ছে, কিন্তু একটা তীরও লাগছে না জন্তুটার গায়ে। বাদশাহ্‌র লোকজনরা জন্তুটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তীরন্দাজও শিকারীদের সারির মধ্যে দাঁড়াল।

তাড়া খাওয়া জন্তুটা হঠাৎ তীরন্দাজের দিকে লাফিয়ে পড়ে তাকে পাশ কাটিয়ে দারুণ জোরে দৌড়ল পাহাড়ের দিকে।

বাদশাহ তীর ছুঁড়ল পালিয়ে যেতে থাকা জন্তুটার দিকে, কিন্তু আবার ফসকাল তীরটা। তখন তীরন্দাজ নিজের ধনুকের ছিলায় টান দিল, তীর লেগে জন্তুটা মরে পড়ে গেল।

প্রচণ্ড রেগে গেল বাদশাহ, আদেশ দিল মৃত্যুদণ্ড দিতে ঐ শিকারীকে যে বাদশাহ্‌র শিকারে হাত দিতে সাহস করে।

তীরন্দাজের হাতপা বেঁধে আনা হল শহরে একেবারে ফাঁসি কাঠের কাছে।

তীরন্দাজ বাদশাহকে বলল: 'হুজুর। আমাকে দু'ঘণ্টা সময় দিন, আমার বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে আসি!'

অবাক হল বাদশাহ যে লোকটি মৃত্যুর আগে মনে করছে কোন এক বন্ধুর কথা। ফাঁসি স্থগিত রাখতে আদেশ দিল আর প্রহরীকে বলল তীরন্দাজকে তার বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে:

'বিদায় নিয়ে আসুক। কিন্তু দেখিস পালায় না যেন। ঠিক দু'ঘণ্টা পরে ফাঁসি হবে ওর।'

তীরন্দাজ গেল তার প্রথম বন্ধুর কাছে। ওদিকে বাদশাহও বেশ বদলে চাষী সেজে চলল তাদের পিছন পিছন। তার দেখতে ইচ্ছা হল কে সে বন্ধু আর কেমন ভাবে সে গ্রহণ করবে তীরন্দাজকে তার এই বিপদের দিনে।

গরীব চাষীর বাড়ীর কাছে এসে তীরন্দাজ তার বাড়ীর ফটকে ধাক্কা দিল। বেরিয়ে এল চাষী, তীরন্দাজকে দেখে খুব খুশী হয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাড়ীর ভিতরে যেতে আহবান জানাল।

'বন্ধু, তুমি দেখছ না আমি প্রহরীপরিবৃত? আমার সর্বনাশ হয়েছে।'

তীরন্দাজ বলল তাকে নিজের ব্যর্থ শিকারাভিযানের কথা, বাদশাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ, জন্তুটা মারা আর তার নিজের মরতে যে আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকী আছে সেকথা।

তখন চাষী বলল:

'দাঁড়াও, ভেঙে পড়ো না, বন্ধু। আমার একমাত্র ঘোড়াটা আমি বাদশাহকে দিয়ে বলব যেন তোমাকে ছেড়ে দেন।'

চাষীর বেশে বাদশাহ কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনল। 'আশ্চর্য লোক। নিজের শেষ ঘোড়াটাও অমনি দিয়ে দিতে কষ্ট হবে না?' ভাবল বাদশাহ।

চাষী তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়াটা বার করে নিয়ে এসে চলল তীরন্দাজের সঙ্গে সঙ্গে।

'দাঁড়াও, এই আমার দ্বিতীয় বন্ধুর বাড়ী।' বলল তীরন্দাজ। 'এর কাছেও, বিদায় নিতে হবে আমায় !'

সে বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল সে।

বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ো। তীরন্দাজকে দেখে খুশী হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

তীরন্দাজ বুড়োকে বলল নিজের বিপদের কথা।

'না, এ আমি হতে দেব না।' বলে উঠল বুড়ো। 'বাদশাহের পায়ে পড়ে তোমাকে মাফ করতে বলব আমি। সারা জীবন বাদশাহের সেবা করেছি আমার অনুরোধ তিনি রাখবেন না তা হতে পারে না। আর যদি তাঁর কারুর মাথার প্রয়োজনই হয়ে থাকে তো আমার সাদাচুলেভরা মাথাটাই নিন !'

ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব শুনল বাদশাহ, ভাবল: 'এ হতেই পারে না, পরের জন্য নিজের জীবন দেবে না কেউই।'

দু'জন বন্ধুকেই সঙ্গে নিয়ে তীরন্দাজ চলল বদশাহের প্রাসাদের দিকে।

যেতে যেতে হঠাৎ তীরন্দাজ দেখতে পেল তার তৃতীয় বন্ধুর বাড়ী।

'দাঁড়াও, আরও খানিক সময় আছে আমার।' বলে উঠল সে। 'আমার তৃতীয় বন্ধুর কাছেও বিদায় নিতে হবে আমায় , যদি এখন ওর বাড়ীতে না ঢুকি আমি তো তার খুব দুঃখ হবে।'

প্রহরীরা তাকে তৃতীয় বন্ধুর কাছে যেতে দিতে চাইল না। তারা ভাবল যদি প্রাসাদে ফিরতে দেরী হয়ে যায় তাহলে বাদশাহ তীরন্দাজের সঙ্গে তাদেরকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

'আরে ! মরতে দেরী কখনও করে না কেউ !' বলল তীরন্দাজ।

এইসব চেঁচামেচি শুনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল গরীব লোকটি। তীরন্দাজকে দেখে খুশী হয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে, বলল:

'খুব খুশী হয়েছি রে, ভাই ! এস, ভিতরে এস ! আজ তোমার হাত খালি, কিন্তু আমি তোমায় খাওয়াব।'

'বন্ধু রে, আজ আমিই শিকার হয়েছি !'

তীরন্দাজ বলল তাকে সব ঘটনা।

'এ হতে দেব না আমি !' বলল গরীব লোকটি। 'তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত আমি। যদি বাদশাহ সত্যিই তোমায় ফাঁসি দিতে চান তো তরবারি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি।'

সেকথা শুনে ভয় পেয়ে বাদশাহ ভাবল: 'আমার ঐ দাসের মাথা খারাপ হল নাকি ? কোন এক শিকারীর জন্য নিজের প্রভু বাদশাহের গায়ে হাত তোলা যায় নাকি ?'

ভীড়ের থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি প্রাসাদে ফিরে এসে নিজের রাজকীয় বেশ পরে তীরন্দাজ আর তার বন্ধুদের অপেক্ষায় রইল।

যখন তারা এসে পেঁছাল, তখন বাদশাহ বারান্দায় বেরিয়ে এসে ফাঁসি দেবার হুকুম দিল।

জল্লাদ তীরন্দাজকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল ফাঁসিকাঠের দিকে।

তখন চাষী বাদশাহ্‌র কাছে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে বলল:

'জাঁহাপনা! আমার একমাত্র ঘোড়াটা নিয়ে তার বদলে আমার প্রিয় বন্ধুর প্রাণভিক্ষা দিন!'

কোনো উত্তর দিল না বাদশাহ।

তখন বুড়ো বাদশাহ্‌র পায়ে পড়ে বলল:

'হুজুর! সারাজীবন প্রাণভরে সেবা করেছি আপনার, আমার অনুরোধ রাখুন: এই ভালোমানুষটিকে মাফ করে দিন! ওর জায়গায় আমার ফাঁসি হোক বরং!'

চুপ করে বাদশাহ লক্ষ্য করতে লাগল তীরন্দাজ আর তার বন্ধুদের।

তখন তীরন্দাজর তৃতীয় বন্ধু কোন কথা না বলে তরবারি নিয়ে ছুটে গেল বাদশাহ্‌র দিকে।

ভয়ে বাদশাহ হাত নাড়িয়ে পালিয়ে গেল প্রাসাদের ভিতরে। আর সবাই ভাবল দণ্ডিতকে মুক্ত করে দিতে বলছে বাদশাহ।

তখনি তীরন্দাজকে নামিয়ে আনা হল ফাঁসিকাঠ থেকে। বন্ধুরা তাকে বুকে চেপে ধরল। সব লোকে বলতে লাগল যে বন্ধুর ভালবাসার জোর বাদশাহ্‌র রাগের চেয়েও বেশী।

ТАДЖИКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали

ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Перевод сделан по книгам: Таджикские народные сказки.—М. Дет. лит., 1964; Таджикские народные сказки.—Душанбе: Црфон, 1967; Таджикские народные сказки.—М.: Издательство Восточной литературы, 1961.

Редактор русского текста *И. В. Логинов*
Контрольный редактор *С. Ш. Шахидоятов*
Ответственный за выпуск *М. Л. Муминова*
Художник *Д. М. Мурсалимов*
Художественный редактор *С. Г. Сылка*
Технический редактор *Х. У. Бабамухамедова*

ИБ 5917

Сдано в набор 6.10.89. Подписано в печать 14.02.90. Формат 70×90 1/16. Бумага тип. № 1. Печать высокая. Гарнитура бенгали. Усл. печ. л. 8,19. Усл. кр-отт. 8,20. Уч. изд. л. 11,3. Заказ №1363. Тираж 7210 Цена 1р. 70 к. Изд. № 30385.

Ташкентское отделение издательства «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 700011, ГСП Ташкент, Ц—14, д. 33.

Фирма-партнер: «Маниша Грантхалая», Калькутта, Индия.

Типография №3 Ташкентского полиграфического производственного объединения «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 700194, Ташкент, Юнусабад, ул. Мурадова 1